মীর্জা গালিব

অনুবাদ

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া. নয়াদিল্লি

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, 1966

Rs. 5.25

পরিবেশক

সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি

22, রাজা উডমণ্ড স্ট্রিট,

কলকাতা–700 001

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত এবং পুরাণ প্রেস, 21, বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-700 004 থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

কাবুলের অধিপতি

বাবর যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল ইব্রাহীম লোদীর অধিকার ভুক্ত ছিল। ইব্রাহীম লোদীর কিছু সংখ্যক বিক্ষুব্ধ পারিষদ বাবরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন লোদী বংশের এই শেষ রাজাকে আক্রমণ করে তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে তাঁদের সাহায্য করতে। ভারতের সমৃদ্ধ ও উর্বরা ভূমির উপর বাবরের লুব্ধ দৃষ্টি এর আগেই পড়েছিল। পর্বতাকীর্ণ ও অসুবিধাজনক নিজের এই রাজধানী কাবুল থেকে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা সুযোগের জন্য বাবর এই সময় অপেক্ষারত ছিলেন। কাজেই সম্ভাবনাজনক এই আমন্ত্রণটি পেয়েই তিনি তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলেন। এর পর মুষ্টিমেয় সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে তিনি সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করলেন। 1526 খ্রীস্টাব্দের 21শে মার্চ পানিপথ নামক স্থানে ইব্রাহীম লোদীর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধ হ'ল তাতেই তাঁর ভাগ্য নির্ণীত হয়ে গেল। ইব্রাহীম লোদীর সৈন্যবাহিনী এই যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং তিনি স্বয়ং এই যুদ্ধে প্রাণ হারালেন। সেদিন পানিপথের যুদ্ধে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল।

পানিপথের যুদ্ধজয় ভাগ্য-নির্ণায়ক হলেও এটাকে ভারত-বিজয় বলা চলে না। এই ঘটনার পর বাবর প্রায় চার বছর মাত্র বেঁচে ছিলেন। ছোট ছোট রাজ্যের সেনানায়ক ও রাজাদের সঙ্গে সংঘর্ষেই এই চার বছরের অধিকাংশ সময় কেটে গিয়েছিল। 1530 খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুঁ যখন সিংহাসনে বসলেন, তখন এই নব স্থাপিত সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা বা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। হুমায়ুঁকে নিরন্তর প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এর ফলে তাঁকে এ দেশ ছেড়ে ইরাণে পালিয়ে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে শেরশাহ সূরী একটি নূতন রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন; অবশ্য তাঁর উত্তরাধিকারিগণের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার কারণে এই রাজবংশ দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে নি। এরই মধ্যে হুমায়ুঁ নিজের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ইরাণের রাজার কাছ থেকে সামরিক সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 1555 খ্রীস্টাব্দে ইরাণীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে হুমায়ুঁ ভারতে ফিরে আসেন। এই সময় শেরশাহ সূরীর শূন্য সিংহাসনে বসেছিলেন তাঁর পুত্র সলীম শাহ। 1545 থেকে ইনি রাজত্ব করছিলেন। সলীম শাহকে যুদ্ধে ভীষণ ভাবে পরাজিত করে হুমায়ুঁ তাঁর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। এবারের এই বিজয় স্থায়ী হয়েছিল। এর পরবর্তী তিনশত বৎসর কাল পর্যন্ত ভারতে মুঘল শাসন অব্যাহত ছিল।

হুমায়ুঁর পর তাঁর পুত্র আকবর 1556 খ্রীস্টাব্দে তাঁর

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ইংলণ্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের সমসাময়িক ছিলেন। এঁরা দুজনেই শাসক হিসাবে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন এবং স্থায়ী কীর্তি রেখে যেতে পেরেছিলেন। আকবরের অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী রাজত্ব-কাল ভারতের ইতিহাসের অতি গৌরবময় কাল রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। এই সময়ে দেশে সর্ব ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছিল। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও সমৃদ্ধি ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা ও লোক-প্রিয়তা এই যুগটিকে বিশিষ্টতা মণ্ডিত করেছিল। আগ্রার রাজদরবার ইরাণ ও পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে সকল-প্রকার ভাগ্যান্বেষীদের নিকট মক্কার মত একটি বিশেষ আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠেছিল। এই ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে ছিলেন— জ্ঞানী, পণ্ডিত, লেখক, সৈনিক, কূটনীতিবিশারদ ইত্যাদি। আকবরের যশোরাশি অল্পসময়ের মধ্যেই ইউরোপ মহাদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এইভাবে বহু নবাগত স্রোতের মত অবিচ্ছিন্নভাবে ভারতে আসায় ভারতীয় সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নিত্য নব রক্তের সঞ্চার সম্ভব হয়েছিল। আর এই সংযোজনের ফলে সর্ববিষয়ে বিকাশের অগ্রগতি অব্যাহত হয়েছিল।

আকবরের পর সাম্রাজ্যের বৈষয়িক উন্নতি পরবর্তী তিন প্রজন্ম পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে অবক্ষয়ের লক্ষণগুলি বেশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল। এই স্পষ্ট অবক্ষয়ের বেশ কিছু আগে থেকেই সাম্রাজ্যের মধ্যে ভাঙন

ধরেছিল, বলতে গেলে আকবরের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে। খুব একটা বড় ধরনের সামরিক সাফল্য লাভের নজির জাহাঙ্গীর, শাজাহান বা ঔরঙ্গজেব— এঁরা কেউই দেখাতে পারেন নি। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্য সামরিক দিক থেকে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে সম্রাটকে তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছর স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে থেকে যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল। এই রণক্ষেত্র থেকে তিনি নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন নি। 1707 খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আহম্মদনগরে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। পরবর্তী একশো পঞ্চাশ বছর ধরে এই রাজবংশ ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়েছিল। 1857 খ্রীস্টাব্দে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে ইংরাজেরা সিংহাসনচ্যুত করে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেন— এই হল মুঘল রাজবংশের চরম পরিণতি। ভারতে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন ইরাণের নৃপতি নাদির শাহ্‌। ইনি ভারত আক্রমণ করে মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি 1739 খ্রীস্টাব্দে রাজধানী অধিকার করেন ও লুণ্ঠন চালান। এই আঘাত সামলিয়ে উঠতে না উঠতেই আহম্মদ শাহ আব্দালী সসৈন্যে চড়াও হয়ে নাদির শাহের মতই লুণ্ঠন চালান। এই আক্রমণ ও লুণ্ঠন অনুষ্ঠিত হয় 1761 খ্রীস্টাব্দে। এই ঘটনার পর প্রায় আরও এক শতাব্দী কাল মুঘল সাম্রাজ্য টিঁকে ছিল, তবে রাজশক্তি হয়ে উঠেছিল খুবই দুর্বল। শেষ পর্যন্ত শুধু মাত্র দিল্লীর মধ্যেই

এদের রাজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশগুলি একে একে স্থানীয় শাসকদের অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ে। এই স্বাধীন শাসকদের এক সময়ে সম্রাট নিজেই সুবেদার অথবা সেনাপতিরূপে ওই-সব অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন।

পরিবার

বিদেশী কোন আগন্তুককে আকর্ষণীয় জীবিকা অথবা সম্মান-জনক কোন পদ দেওয়ার মত সামর্থ্য শেষ দিকে দিল্লীর মুঘল দরবারের আর ছিল না। তাদের আশ্রয় দান করাও সম্ভব ছিল না। ফলে এইরূপ ভাগ্যান্বেষীদের আগমন-স্রোত প্রায় নিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, শেষ দিকে ক্বচিৎ কেউ আসতেন। মুঘল সাম্রাজ্যের এই পতনের কালে দেখা যেত যে রুজি-রোজগারের চেষ্টায় এমন দু-চার জন বিদেশী আসছে, যারা যে বেশী মাইনে দেবে এমন যে-কোন একজনের অধীনে চাকরী করতে বা লড়াই করতে সদাই প্রস্তুত। এমনি একজন ভাগ্যান্বেষী, সৈনিক ছিলেন তুর্ক সৈনিক কুক্কান বেগ খাঁ। ইনি সমরকন্দ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে আসেন। এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় যার থেকে ধরে নেওয়া যায় যে এঁর বড় বড় মানুষের সঙ্গে জানাশুনা ছিল। ইনি সম্ভ্রান্ত পরিবারেই জন্ম-গ্রহণ করেন, এই পরিবার এক সময়ে বেশ সমৃদ্ধিশালীও ছিল। ইনি প্রথমে পাঞ্জাবের সুবেদার মোহমুলমুক-এর অধীনে চাকরী

নিয়েছিলেন। লাহোরে অল্প কিছুদিন থেকে ইনি দিল্লী চলে আসেন। দিল্লীতে এসে ইনি জুল্‌ফেকরুদ্দৌলা মির্জা নজ্‌ফের আশ্রয় নেন। এঁর সুপারিশে কুক্কান বেগ খাঁ সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের দরবারে একটি চাকুরী পেয়ে যান। সম্রাট্ কুক্কান বেগ খাঁকে 50 জন ঘোড়সওয়ারী সৈন্যের নায়কত্ব দান করেন; তাঁকে জয়ঢাক ও পতাকা বহনের মর্যাদাও দেওয়া হয়। নিজের এবং সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্রাট্ এঁকে বুলন্দসর্ জেলার পিহাসু-নামক উর্বর ভূভাগের জায়গীরও দান করেন। একজন প্রকৃত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে এমন একটা চাকরী বা জায়গীর খুব বেশী আকর্ষণীয় ছিল না, এই পদে থেকে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাও ছিল খুবই কম। এই-সব কারণে কুক্কান বেগ খান্ সম্রাটের চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়ে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় জয়পুরের মহারাজার সৈন্যদলে চাকুরী নিয়েছিলেন। কতদিন তিনি জয়পুরে ছিলেন তা ঠিক জানা যায় না। তবে কিছুদিন পর তিনি যে স্থায়ীভাবে আগ্রায় বাস করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুক্কান বেগের পরিবার বেশ বড় ছিল। তবে এই পরিবারের সকলের কথা জানা যায় না, শুধু এঁর দুই পুত্রের বিষয়ই জানা যায়। এই দুই পুত্রের নাম ছিল— নসরুল্লা বেগ খাঁ ও আবদুল্লা বেগ খাঁ। পিতার মতই এঁরা দুজন সৈনিক বৃত্তি বেছে নিয়েছিলেন। নসরুল্লা বেগ খাঁ মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী নিয়ে শেষ পর্যন্ত জেনারেল পেরঁর অধীনে আগ্রা কোর্টের 'গভর্নর' পদে

আসীন হতে পেরেছিলেন। ফরাসী দেশীয় এই জেনারেল পের' গোয়ালিয়রের মহারাজার অধীনে একজন পেশাদার যোদ্ধা ছিলেন। আবদুল্লা বেগ খাঁ তাঁর এই ভ্রাতার মত ভাগ্যবান ছিলেন না। ইনি প্রথমে লক্ষ্ণৌ আসেন। এই সময়ে আসফ-উদ্দৌল্লা (1775-1797) ছিলেন নবাব-উজীর। সম্ভবত: আবদুল্লা বেগ এখানে রুজি-রোজগারের কোন সুবিধা না পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে হায়দ্রাবাদে চলে আসেন। এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন নবাব নিজাম আলি খান্। আবদুল্লা নিজামের অধীনে একটা ছোটখাট চাকুরী পেয়ে বেশ ক'বছর দাক্ষিণাত্যেই থেকে যান। নিজামের সভাসদ্দের পারস্পরিক ঝগড়াঝাঁটির ফলে আবদুল্লা বেগের চাকুরী খতম হয়ে যায়। চাকুরী হারিয়ে আবদুল্লা আলোয়ারে এসে মহারাও বক্তাওর সিং (1791-1803)-এর অধীনে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। একটা আঞ্চলিক বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে কিছুদিন পর আবদুল্লা নিজেই দুর্ভাগ্যক্রমে নিহত হন। তাঁকে এই বিদ্রোহ দমন করতে পাঠানো হয়েছিল। এই-সমস্ত ঘটনাগুলি গালিব-লিখিত একটি চিঠিতে উল্লিখিত হয়েছে। গালিব লিখেছেন :

আমার পিতামহের মৃত্যুর কালে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তার ফলে পিহাসু পরগণার জায়গীর হারাতে হয়েছিল। আমার পিতা আবদুল্লা বেগ লক্ষ্ণৌ গিয়ে নবাব আসফউদ্দৌল্লার দরবারে চাকরী গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর তিনি হায়দ্রাবাদ চলে যান। এখানে তিনি নবাব নিজাম আলি খানের অধীনে

300/400 অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়করূপে নিযুক্ত হন। বহু বৎসর তিনি এখানে ছিলেন। পারিবারিক কলহের ফলে তাঁর এই চাকুরী খতম্ হয়ে যায়। চাকুরী-হারা অবস্থায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি আলোয়ারে চলে এসে রাও রাজা বক্তাওর সিং-এর অধীনে চাকুরী পান। এখানেই একটি খণ্ড বিপ্লবে তিনি নিহত হন।

গুলাম হুসেন নামে মুঘল বাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতির পরিবারে আবদুল্লা বেগ খানের বিবাহ হয়েছিল। মৃত্যুকালে আবদুল্লা বেগের তিনটি সন্তান ছিল— একটি মেয়ে ও দুটি ছেলে। এই দুটি ছেলের মধ্যে যেটি বড় তিনিই আমাদের বিখ্যাত কবি গালিব। এঁর আসল নামটি অবশ্য ছিল আসাদুল্লা বেগ খান্। 1797 খ্রীস্টাব্দের 27শে ডিসেম্বর এঁর জন্ম হয়। এঁর ছোট ভাই ইউসুফ আলি খান্ এঁর থেকে বয়সে দু-বছরের ছোট ছিলেন; তিন ভাই-বোনের মধ্যে মেয়েটি ছিলেন সব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠা। আবদুল্লা বেগ খানের মৃত্যুর পূর্ব থেকেই পরিবারটি আগ্রায় বাস করতেন, কারণ আবদুল্লা বেগ যে যাযাবর জীবন যাপন করতেন তাতে সমগ্র পরিবারটির তাঁর সঙ্গে একত্র বাস সম্ভব ছিল না। সেইজন্য গালিবের জননী আগ্রায় তাঁর পিত্রালয়েই বাস করতেন। গালিবের মাতামহ বেশ সচ্ছল অবস্থার লোক ছিলেন, তাঁর প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ছিল, এগুলি এখনও বর্তমান আছে। 1802 খ্রীস্টাব্দে আবদুল্লা বেগ খানের যখন মৃত্যু হয় তখন গালিবের বয়স মাত্র চার বছর। এই সময় থেকে এই পরিবারটির

অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়েছিলেন আবদুল্লা বেগ খানের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা নসরুল্লা খান্।

এই সময়ে ব্রিটিশ রাজশক্তি অতি দ্রুত উত্তর-ভারতে প্রসারিত হচ্ছিল। ছোট বড় জায়গীর বা রাজত্ব একে একে গ্রাস করে ইংরেজরা তাদের অধিকার ও প্রভুত্ব দৃঢ়বদ্ধ করে নিচ্ছিল। ব্রিটিশসেনাধ্যক্ষ লর্ড লেক 1803 খ্রীস্টাব্দে যখন আগ্রা অভিযানে আসেন তখন নসরুল্লা বেগ আগ্রা দুর্গের সেনাধ্যক্ষ। নসরুল্লা বেগ খান্ নবাব আহাম্মদ বক্স খানের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। শ্যালকের পরামর্শে নসরুল্লা বিনা প্রতিরোধে লর্ড লেকের নিকট আগ্রা দুর্গ সমর্পণ করেন। এই বিশেষ সেবা বা আনুগত্যে পুরস্কার স্বরূপ ব্রিটিশের পক্ষ থেকে তাঁকে চারশো অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কের পদ দেওয়া হয়, তাঁর এবং সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষণের জন্য মাসিক 1700 টাকা বেতন নির্ধারিত করা হয়। পরবর্তী কালে নসরুল্লা বেগ খান্ ইন্দোর রাজ্যভুক্ত ও ভরতপুর-সন্নিহিত সোঙ্ক ও সুসা নামে দুটি জেলা দখল করে নিয়েছিলেন। লর্ড লেক যখন এই দখলের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি এই দুটি জেলার আজীবন স্বত্ব নসরুল্লাকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। পরলোকগত ভ্রাতার পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়েছিল, এই দুটি জেলার স্বত্ব লাভ করায় তাঁর মনে হয়েছিল যে অপেক্ষাকৃত আরাম ও স্বচ্ছন্দে তিনি পরিবারটি প্রতিপালন করতে পারবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই অবস্থা স্থায়ী হয় নি।

1806 খ্রীস্টাব্দে জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে নসরুল্লা খান্ হস্তিপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যান এবং এই আঘাতের ফলে কয়েকদিন পরই তাঁর মৃত্যু হয়। গালিব ও তাঁর ভাই-এর শৈশব কাল তখনও উত্তীর্ণ হয় নি। জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার তাঁরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়লেন।

নবাব আহাম্মদ বক্স খান এই সময়ে ফিরোজপুরের ঝিরকা ও লোহারু নামে দুটি ছোট জায়গীরের শাসনভার পেয়েছিলেন। ঝিরকার জায়গীরটি তিনি পেয়েছিলেন ব্রিটিশের কাছ থেকে। লোহারুর জায়গীরটি তাঁকে দিয়েছিলেন আলোয়ারের বক্তাওয়ার সিং। নসরুল্লা বেগ ছিলেন তাঁর নিকট আত্মীয়। এইজন্য নসরুল্লা বেগের মৃত্যুর পর তাঁর অভিভাবকহীন ভ্রাতুষ্পুত্রদের ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। লর্ড লেককে অনুরোধ করে তিনি পরলোকগত নসরুল্লা খানের পরিবারের জন্য বার্ষিক দশ হাজার টাকা পেনসন মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন। এক মাস পরে অবশ্য তিনি একটা এইরূপ নির্দেশ পেয়েছিলেন যে দশ হাজার বার্ষিক ভাতার পরিবর্তে মাসে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এক মাস পরে আবার এমন ভাবে বাঁটোয়ারার আদেশ পাওয়া গেল যাতে এই পাঁচ হাজারের মধ্যে দু' হাজার টাকা পাবে কে এক খাজা হাজী— মোট টাকার সিংহ-ভাগ। বাকী টাকা পাবে পরিবারের বাকী ছয় জন। এর মধ্যে গালিবের ভাগ্যে জুটেছিল বার্ষিক সামান্য 750 টাকা।

গালিবের জননী তখনও তাঁর পিত্রালয়ে বাস করছিলেন।

এঁর পিতা কোন্ সময়ে যে মারা যান তা জানা নেই। ইসলামীয় শাস্ত্র অনুযায়ী কন্যাও পুত্রদের মত পিতার সম্পত্তির অধিকারিণী হন। এই প্রথাটি যে সর্বত্র মেনে চলা হয় তা নয়, তবে নিষ্ঠাবান মুসলিম পরিবারে এই প্রথা মেনে চলা হয়। সেইজন্য মনে হয় যে গালিব-জননী তাঁর পিতা গুলাম হোসেন খানের সম্পত্তির একটা অংশ পেয়েছিলেন। এই সম্পত্তি অবশ্যই বেশ মূল্যবান ছিল। কাজেই মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন গালিবকে অর্থকষ্ট বিশেষ পেতে হয় নি।

শিক্ষা ও প্রারম্ভিক জীবন

ইসলাম প্রবর্তনের সূচনা থেকেই কোরান মুসলিমদের জ্ঞানের ভাণ্ডাররূপে গৃহীত হয়ে এসেছে। বিদ্যার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করার সময় কোরান ও ধর্মশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখেই তা করা হত। ছাত্রদের এমন সব বিষয়ই পড়ানো হত যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজের নিজের জীবনে ধর্মের মূল শিক্ষা অধিগত করে ইসলাম ধর্মের সত্য ও মহিমাকে প্রতিফলিত করতে পারে। প্রতিটি গ্রামে ও নগরে বলতে গেলে মসজিদগুলিই ছিল এমনি শিক্ষাকেন্দ্র। মসজিদে যে মৌলবী 'নমাজ' পড়ান, তিনিই অন্যসময়ে এই শিক্ষা দান করতেন। একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্থানীয় শিশুরা মসজিদে এসে জুটত। মৌলবী সাহেব তখন তাদের কোরান ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়িয়ে দিতেন। পরবর্তীকালে উচ্চ

শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র প্রবর্তিত হয়; এখানে উচ্চতর ও বিশিষ্ট বিষয়গুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলিতে শিক্ষা প্রণালী প্রায় এই এক-প্রকারই ছিল।

মুসলমানগণ যখন ভারতে আসেন তখন তাঁরা এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাও নিয়ে আসেন। এদেশেও স্থানীয় মসজিদগুলিই হয়ে উঠেছিল শিক্ষা-কেন্দ্র। শিশুরা শিক্ষার জন্য মসজিদে যেত এবং বলতে গেলে মৌলবীই হতেন তাদের একমাত্র শিক্ষক। তাঁকে সব শিক্ষণীয় বিষয়গুলিই পড়াতে হত। এই বিদ্যালয়গুলি 'মক্তব' নামে পরিচিত ছিল। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও টিঁকে আছে— একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। ছোট ছোট গ্রামে এখনও এই ধরনের কিছু কিছু বিদ্যালয় দেখা যায়।

পরবর্তীকালে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকেও শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে সহায়তা পাওয়া গিয়েছিল। ধরা যাক্, কোন এক ধনী ব্যক্তির বিদ্যালয়ে শিক্ষাযোগ্য বয়সের একটি পুত্র আছে। শহরের আর পাঁচটি মামুলী ঘরের ছেলের সঙ্গে তাঁর মত বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র মসজিদে একসঙ্গে বসে পড়বে এটা তাঁর পক্ষে সম্মান-হানিকর। এই অবস্থাটা এড়াবার জন্যে তিনি হয়তো ব্যবস্থা করলেন যে একজন শিক্ষক শুধু তাঁরই বাড়ীতে এসে তাঁর ছেলেকে পড়িয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা হওয়ার পর তাঁর বন্ধু-বান্ধব বা সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ছেলেরাও তাঁর বাড়ীতে

তাঁর ছেলের সঙ্গে পড়তে আসত। এইভাবে একটি ছোটখাট বিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে যেত। সরকার বা কোন ধর্মীয় ট্রাস্ট-পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা তখনকার দিনে ছিল খুবই অল্প। কখনও কখনও কোন উৎসাহী পণ্ডিত-ব্যক্তি নিজের বাড়ীতেই একটি বিদ্যালয় খুলে বসতেন। তিনি এবং তাঁর অন্যান্য শিক্ষিত বন্ধুরা নিজেরাই শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়ে বিদ্যালয় চালাতেন। এঁদের উপর আস্থাশীল অভিভাবকেরা তখন নিজের নিজের ছেলেদের এই-সব বিদ্যালয়ে পাঠাতেন। এইভাবে শিক্ষা-বিস্তার লাভ করত।

গালিবের শিক্ষা-জীবন সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্যই পাওয়া যায়। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে ঐ সময়ে মুহম্মদ মুয়াজুম নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আগ্রা শহরে একটি বিদ্যালয় বা মাদ্রাসা চালাতেন। গালিব এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তখন ফার্সী ভাষা শুধু সরকারী কাজে ব্যবহৃত ভাষাই ছিল না, চিঠিপত্র ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমও ছিল এই ফার্সী ভাষা। স্বাভাবিক কারণেই পাঠ্য-পুস্তকের ভাষাও ছিল ফার্সী। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলি 'উর্দু' ভাষায় রচিত হবে সেভাবে উর্দু ভাষার প্রতিষ্ঠালাভ তখনও হতে পারে নি। কাজেই পঠদ্দশায় গালিব শুধু ফার্সী ভাষাই শিক্ষা করেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত ফার্সীই ছিল শিক্ষার মাধ্যম। গালিব ছাত্রাবস্থায় কোন কোন ক্লাসিক ফার্সী লেখকদের রচিত গদ্য ও কাব্যপুস্তকগুলি পড়েছিলেন— এটা ধরে নেওয়া হয়ে

থাকে। শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে আরবী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা ছিল। তবে গালিব ততটুকু স্তর পর্যন্ত পৌঁছে-ছিলেন বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ বারো বৎসর বয়স পর্যন্তই গালিব এই বিদ্যালয় বা মাদ্রাসায় পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

গালিব লিখেছেন যে এই সময়ে আব্দুস সমাদ নামে এক ফার্সী ভাষার পণ্ডিত আগ্রায় আসেন। আব্দুস সমাদ জরথুস্ট্র ধর্মাবলম্বী (পার্শী) পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও পড়াশুনা করে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং স্বেচ্ছায় এই ধর্ম অবলম্বন করেন। তিনি ফার্সী এবং আরবী উভয় ভাষাতেই পারদর্শী ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই জরথুস্ট্রীয় ও ইসলাম এই উভয় ধর্ম-বিষয়েই তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। আমাদের তরুণ কবি (গালিব) এই সুপণ্ডিত-পরিব্রাজকের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি তাঁকে তাঁর পরিবারভুক্ত হয়ে বছর দুই (1810-12) আগ্রায় বাস করতে অনুরোধ করেন। গালিব এই দুই বৎসর তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে এত জ্ঞান অর্জন করেন যা পরবর্তী জীবনে তাঁর বিশেষ কাজে লেগেছিল। 1812-13 খ্রীস্টাব্দে গুরু-শিষ্য দুজনেই আগ্রা থেকে দিল্লীতে আসেন। গালিব আসেন দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বাস করতে। আব্দুস সমাদ দিল্লীতে এসে তাঁর ছাত্র ও তরুণ বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে চলে যান। বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী শিষ্যরূপে গালিব চিহ্নিত হয়েছিলেন বলেই ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও তার সঙ্গে পত্রালাপ চালাতেন বলে জানা যায়।

দিল্লী আগমন

কোন্ কারণে গালিব আগ্রা ত্যাগ করে দিল্লীতে বসবাসের সংকল্প নিয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই। শাহজাহানের সময় পর্যন্ত আগ্রাই ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী। শাহজাহান দিল্লীর লাল কেল্লা তৈরী করিয়ে 1646 খ্রীস্টাব্দে আগ্রা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পরও আগ্রা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকেই গিয়েছিল কিন্তু দিল্লীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সামর্থ্য তার ছিল না। দেশের কেন্দ্রস্থলে দিল্লীর অবস্থিতি, সম্ভবতঃ এই কারণেই গালিব আগ্রা ছেড়ে দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে আসেন। এটা ছাড়া আরও একটা কারণ সম্ভবতঃ আছে। 1810 খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে তেরো বৎসর বয়সে গালিব ইলাহি বক্স খানের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই ইলাহি বক্স খান্ ছিলেন ফিরোজপুরের ঝিরকা ও লোহারুর নবাব আহাম্মদ বক্স খানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এঁরা সব দিল্লীর অধিবাসী। সম্ভবতঃ এঁরাই গালিবকে দিল্লীতে এসে বসবাস করতে রাজী করিয়েছিলেন।

নবাব আহাম্মদ বক্স খান্ ছিলেন লোহারুর নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা বা আদি-পুরুষ। এমন-কিছু তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে নবাব আহাম্মদ বক্স খানের পিতা মির্জা আরিফজান ও তাঁর দু ভাই অষ্টাদশ শতকের

মধ্যভাগে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আসেন। মির্জা গালিবের পিতামহ কুক্কান বেগ খানও ঠিক সেই সময়ে ভারতে আসেন। নবাব আহাম্মদ বক্স খানের ভগ্নীর সঙ্গে গালিবের জেঠার বিবাহের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে এই দুই পরিবারের মধ্যে আগে থেকেই যে নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, আর একটি বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা সেই বন্ধনকে আরও দৃঢ় করা হয়েছিল।

প্রথম দিকে আহাম্মদ বক্স খান্ বেশ বড় ধরনের অশ্ব-ব্যবসায়ী ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি গোয়ালিয়রের মহারাজার সংস্পর্শে এসে এই ব্যবসায় ছেড়ে দেন। যাই হোক, মহারাজার সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিছু কাল পর তিনি আলোয়ারে চলে আসেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আলোয়ার-অধিপতির এতদূর আস্থা অর্জন করেন যে তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে লর্ড লেককে সাহায্য করতে যে সৈন্যবাহিনী পাঠান তার অধিনায়ক পদে তিনি আহাম্মদ বক্স খানকেই নিযুক্ত করেছিলেন। বীরত্ব ও বিচক্ষণতার জন্যে লর্ড লেকের মনে তাঁর সম্বন্ধে এমন একটা উচ্চ ধারণা জন্মেছিল যে লর্ড লেক ভারতীয় রাজা-নবাব বা কোন রাজ্য সম্বন্ধে কোন কিছু নীতি গ্রহণ করার পূর্বে আহাম্মদ বক্স খানের পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং এই পরামর্শ অনুযায়ী ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারিত হত। 1803 খ্রীস্টাব্দে লর্ড লেক যখন বর্তমান উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগ অধিকার করে নেন তখন তিনি ফিরোজপুর জিরকা, পালওয়াল,

হোদাল প্রভৃতি স্থানের জায়গীর আহাম্মদ বক্স খানকে উপঢৌকন স্বরূপ দান করেন। যে দরবারে আহাম্মদ বক্স খানকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই জায়গীরগুলি দেওয়া হয় সেই দরবারে আলোয়ারের মহারাজাও উপস্থিত ছিলেন। আহাম্মদ বক্স খানের গুণ সম্বন্ধে ইংরাজের মত তিনিও অবহিত এটা দেখানোর জন্য তিনি আহাম্মদ বক্স খানকে বিশ্বস্ত সেবার জন্য লোহারু নামক স্থানের জায়গীরও দান করেছিলেন। এইভাবে আহাম্মদ বক্স খান্ হয়ে গেলেন ফিরোজপুর জিরকা ও লোহারুর প্রথম নবাব।

নিজের রাজধানী ফিরোজপুরে হলেও আহাম্মদ বক্স খান্ অধিকাংশ সময় দিল্লীতেই কাটাতেন। ইংরাজেরা উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলির শাসনকার্য দিল্লী থেকেই পরিচালন করতেন। নবাবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইলাহী বক্স খানও স্থায়ীভাবে দিল্লীতেই বাস করতেন। ইলাহী বক্স খান্ শুধু একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কবিই ছিলেন না, ধর্মীয় নেতৃমণ্ডলীর মধ্যেও তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। 'মঅরুফ' এই ছদ্মনামে উর্দু ভাষায় তিনি কবিতা রচনা করতেন।

উর্দু ভাষা

মুসলমান ও ভারতবাসীদের মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি উর্দু ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করেছিল। একটি

ভাষাকে সুস্পষ্ট পরিণতি লাভের পূর্বে বিকাশের কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। এই প্রক্রিয়া সুদীর্ঘকাল ধরে উত্তর-ভারতে চলে আসতে আসতে এমন একটা অবস্থা হয় যে, একটি নূতন ভাষার আবির্ভাব আসন্ন হয়ে উঠেছিল। দৈবক্রমে এই সন্ধিক্ষণে মুসলমানদের আগমনের ব্যাপারটি ঘটল। এঁরা সঙ্গে আনলেন ফার্সী, যা মূলতঃ আর্য গোষ্ঠীরই একটি ভাষা। এই সম্পন্ন ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্যও ছিল মহত্বপূর্ণ। সর্বোপরি এটি ছিল বিজয়ীগণের নিজস্ব ভাষা। খুব স্বাভাবিক কারণে এটিই রাজভাষা বা সরকারী ভাষা রূপে গৃহীত হয়েছিল। ধীরে ধীরে এই ভাষা দেশীয় শিক্ষিত-জনের মনেও প্রভাব বিস্তার করায় এঁরা নূতন শাসককুলের অনুগ্রহ বা চাকুরীর আশায় এই ভাষাটি শিক্ষা করতে লাগলেন। ভাষার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে যে ওলটপালট চলছিল এখন ফার্সীর প্রভাবে সেটা একটা নূতন রূপ ধারণ করেছিল। কালক্রমে এই মিশ্রভাষা 'উর্দু' নামে পরিচিত হয়েছিল। যে অবস্থায় একটা নূতন ভাষার জন্ম হয়, সেই অবস্থাটি পরিণত রূপ পেয়েছিল। শুধু প্রয়োজন ছিল একটি স্ফুলিঙ্গের। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভেদ করে ভারত অভিমুখে দলে দলে মুসলিমদের আগমন— এই দীপ জ্বালাতে সাহায্য করেছিল। এই নূতন ভাষাটি সর্বাংশে ছিল ভারতীয়— শব্দসম্ভার ও ব্যাকরণের আদর্শের দিক থেকে। এর ক্রিয়া-পদগুলির উৎসও ভারতীয় ভাষা। মুসলিমদের প্রভাব শুধু

এই ভাষার লিপির উপর। কিছু ফার্সী শব্দ, ইরাণীয় ধারণা ও বাগ্‌ধারা অবশ্য এই ভাষায় থেকে গিয়েছে।

প্রথম প্রথম এই ভাষা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধর্মীয় আলোচনায় এবং ধর্মীয় প্রচারকার্যে মুসলমান ধর্ম-প্রচারকেরা ব্যবহার করতেন। উর্দু ভাষার প্রথম যুগের রচনাগুলি নীতি ও আচার-ব্যবহার বিষয়ক। যাঁরা এগুলি রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত। এঁদের রচনায় ইরাণীয় ধ্যান-ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে। কালক্রমে এই ভাষা আরও স্পষ্ট রূপ পেয়েছিল। ফার্সী সাহিত্যের চিরায়ত সাহিত্য সম্পদ ধার করে নেওয়ার জন্য এর ক্ষেত্রও ব্যাপকতর হতে পেরেছিল। অবশ্য এই ভাষার মধ্যে কৃত্রিমতার কিছু দোষ থেকে গিয়েছিল। এর কারণ, ভারতীয় কবিদের মধ্যে যাঁরা উর্দু ভাষায় কবিতা রচনা করতেন তাঁরা যে ফার্সী বাগ্‌ধারা বা উপমা ব্যবহার করতেন তা ফার্সী সাহিত্য-পাঠের ফলেই তাঁদের আয়ত্ত হয়েছিল ; এঁরা কেউই নিজেরা ইরাণে যান নি। ইরাণীয় পরিবেশ জানা না থাকায় এঁদের রচনায় কৃত্রিমতার দোষ স্বাভাবিক কারণেই প্রবেশ করেছিল। এঁদের কবিতা বা শায়রী ছিল অবিমিশ্র কল্পনা ও কৃত্রিমতা-প্রসূত। মীর ও দর্দের মত কয়েকজন কবি ব্যতীত বেশীর ভাগ কবির রচনা উপরোক্ত ধরনের, তাতে না ছিল মৌলিকতা, না ছিল নূতন চিন্তার পরিচয়।

কবিরূপে আবির্ভাব

আগ্রায় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই গালিব 'শায়রী' বা কবিতা লেখা শুরু করেন। প্রথম প্রথম তিনি ফার্সীতেও কবিতা লিখতেন। তবে কিছুদিন পরই ফার্সী লেখা বন্ধ করে তিনি শুধু মাত্র উর্দুতেই লিখতে লাগলেন। এই সময়ে শিক্ষিত সমাজে উর্দুর ব্যবহার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। আমরা আগেই জেনেছি যে গালিবের শিক্ষা প্রধানতঃ ক্লাসিক ফার্সী সাহিত্য পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আব্দুস্ সামাদের সম্পর্কে এসে তিনি ফার্সী সাহিত্যের একনিষ্ঠ-ছাত্র ও প্রেমিক হয়ে ওঠেন। শৈশব কাল থেকেই তিনি শৌকত বুখারী, অসীর ও বেদিলের মত ফার্সী কবিদের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই কবিবৃন্দ তাঁদের বিমূর্ত ও কল্পনাশ্রয়ী রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। গালিব এঁদের অনুকরণ করে উর্দুতে কবিতা রচনা শুরু করেন। তখন পর্যন্ত উর্দু শুধু একটি নূতন ভাষাই ছিল না, ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ-ভাণ্ডার বা পদ-বিন্যাস-পদ্ধতিরও অভাব ছিল। এই অবস্থায় গালিবের কাব্যচর্চার পথ বেশ সুগম ছিল না। তিনি ফার্সী কবিদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এই কবিগণ— বিশেষ করে বেদিলের রচনার বিষয়বস্তু ও শৈলীর তাৎপর্য গ্রহণ বেশ কঠিন কাজ। স্বভাবতই গালিবের এই কালের কাব্যচর্চা বেশ সৌষ্ঠবযুক্ত হয় নি। এই সময়ে লেখা

গালিবের কবিতাগুলি ইতস্ততঃ দু-একটি শব্দ বাদে সবই ফার্সী শব্দে ভরা। অনেক সময় দেখা গেছে যে একটা তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় ভাবকে প্রকাশ করতে গালিব অতি জটিল শৈলীর আশ্রয় নিয়েছেন; ফলে রচনাটি দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে গালিবের এই-সব রচনাকে প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমালোচকেরা এই রচনা-গুলিকে একেবারে বাজে বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। গালিবের রচনাগুলির প্রতি এই দোষারোপ যে নেহাৎ বিদ্বেষ-প্রসূত ছিল তা নয়— এগুলির মধ্যে প্রশংসা করার মত কিছু ছিল না। গালিবের প্রাথমিক যে রচনাগুলি আমাদের কাল পর্যন্ত টিকে আছে সেগুলি সত্যই বুঝে ওঠা কঠিন। 'পর্বতের মূষিক প্রসব' বলে যে প্রবাদ বাক্য আছে এ কবিতাগুলি তার সার্থক দৃষ্টান্ত বলেই অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়।

সৌভাগ্যক্রমে এই প্রতিকূলতা তরুণ কবির উৎসাহ-উদ্দীপনা ম্লান করে দিতে পারে নি। তিনি নির্ভীক চিত্তে হতাশা বিসর্জন দিয়ে ওই কঠিন শৈলীতেই 'শায়রী' করতে থাকলেন। কিছু লোক যেমন তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনায় নেমেছিলেন তেমনি কিছু সমর্থকও তাঁর জুটে গিয়েছিল। এঁরা গালিবের মৌলিকতা ও নূতন প্রয়োগ-চাতুর্যের তারিফ্ জানিয়েছিলেন। গালিবের এমনি একজন সমঝ্‌দার ছিলেন নবাব হুসামুদ্দৌলা। এই অতি সম্ভ্রান্ত পুরুষটি নিজেও ছিলেন কবি। একবার লক্ষ্ণৌ যাত্রা কালে ইনি গালিবের লেখা কয়েকটি 'গজল' সঙ্গে নিয়ে

যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এগুলি মহাকবি মীরকে দেখানো। মীর এই সময় খুব বৃদ্ধ হয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের বাইরে যাওয়ার সামর্থ্য তাঁর ছিল না; বাড়ীতেই তিনি সব সময় বসে থাকতেন। এই সুপ্রসিদ্ধ কবি গালিবের গজলগুলি পাঠ করে ঈষৎ ব্যঙ্গ-পূর্বক মন্তব্য করেছিলেন যে কোন উপযুক্ত গুরু যদি এই তরুণ বালককে পথ দেখিয়ে দিতে পারত তবে এই ছেলেটির ভবিষ্যতে খুব বড় কবি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। পথ দেখিয়ে দেওয়ার লোক (উস্তাদ্) না পেলে অসার কথামালা গেঁথেই এর প্রতিভা শেষ হয়ে যাবে।

এই যে গুরুর কথা বলা হল— এর ভূমিকা পালন করতে পারে নিজেরই সাধারণ বুদ্ধি, অথবা অকপট এক বা একাধিক বন্ধু। কাব্য-স্রোত যখন ঠিক খাতে বইছে না তখন কবির সাধারণ বুদ্ধি তাকে সঠিক নির্দেশ দিতে পারে, আর পারে সৎবন্ধুর যথার্থ সমালোচনা। গালিব লিখতেন প্রচুর। মীরের মন্তব্য থেকে মনে হয় যে তাঁর অতি অল্প বয়সের রচনাগুলি তুচ্ছ করে দেওয়ার মত ছিল না; দোষযুক্ত হলেও রচনার বৈশিষ্ট্য এই-সব রচনায় দীপ্তিমান ছিল। আমরা জানি যে 1810 খ্রীস্টাব্দের 20শে সেপ্টেম্বর মীরের মৃত্যুকালে গালিবের বয়স 13 বৎসরও পূর্ণ হয় নি। আমরা এটাও জানি যে গালিব দশ কি এগারো বছর বয়সের সময় থেকেই কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। মীরকে যখন তাঁর গজলগুলি দেখানো হয় তখন গালিবের কবিজীবন দু-তিন বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে।

সাধারণভাবে উর্দু সাহিত্যে ও বিশেষভাবে উর্দু কাব্যক্ষেত্রে মীরের স্থান সবচেয়ে উঁচু। গজল রচনার ক্ষেত্রে মীর যে অদ্বিতীয় এবং পথিকৃৎ – এই কথাটি সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর পরে 'গজল' রচনায় যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁরা সকলেই তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি বা 'শায়র' রূপে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মীর যে তাঁর সমসাময়িক কবিদের রচনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না এই কথাটিও সুবিদিত ছিল। এ হেন মীরের কাছে কেউ একজন সাহস করে গালিবের গজল দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন এ ব্যাপারটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি এমন এক শ্রেণীর কবি ছিলেন, যিনি ক্বচিৎ কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি বা কাব্যকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন। নবাব হুসামুদ্দৌলা নিজে ছিলেন মীরের অনুরাগী, সুতরাং মীরের মেজাজ তাঁর মতো কারোই জানা ছিল না। গালিবের গজলগুলি মীরকে দেখাতে নিয়ে যাওয়া থেকে বোঝা যায় যে তিনি শুধুমাত্র গালিবের অনুরাগীই ছিলেন না, তাঁর এ বিশ্বাসও ছিল যে গালিবের রচনা মীরের প্রশংসা অর্জন করবে। মীর গালিবের রচনার যে সঠিক মূল্যায়ণ করেন তা তাঁর সূক্ষ্ম সাহিত্যবোধ ও সমালোচনাশক্তির পরিচায়ক।

উর্দু কাব্যে গুরু (উস্তাদ্) ও চেলা (সাক্‌রেদ্) -পরম্পরাটি ইরাণ থেকে এসেছে। একজন তরুণ কবিতা লেখা আরম্ভ করে প্রায়ই উপদেশ গ্রহণের জন্য একজন প্রবীণ কবির দ্বারস্থ হত। যখনি সে কিছু লিখত তখনই সেটা নিয়ে যেত প্রবীণ কবির

কাছে। ইনি শুধু কবিতাটি সংশোধন করেই ক্ষান্ত হতেন না। ভাষার সূক্ষ্ম কারু-কর্ম ও কাব্যের প্রয়োগ-কৌশলও শিষ্যকে বা তরুণ কবিকে বুঝিয়ে দিতেন। এই ঐতিহ্য এত বদ্ধমূল ছিল যে কোন কবির পক্ষে এমনি একজন দিগ্‌দর্শকের সাহায্য না নেওয়ার ব্যাপারটি অসম্ভব ছিল। উস্তাদ্ যতদিন বেঁচে থাকতেন ততদিন তাঁর শিষ্যের কর্তব্য ছিল গুরুর কাছে নিজের রচনাগুলি দেখিয়ে নেওয়া। যাকে 'উস্তাদ্' বলে এই ধরনের কোন শিক্ষক বা গুরুর কাছে প্রথাগতভাবে গালিব 'শিক্ষানবিসী' (সাগ্রিদ) করেন নি। একেবারে প্রথম অবস্থায় গালিব কাউকে তাঁর রচনা দেখিয়ে বা সংশোধন করিয়ে নিতেন কিনা তা জানা যায় না। তবে এটা আমরা জানি যে উত্তর-জীবনে গালিব বলতেন যে কাব্যসাধনায় তাঁর সিদ্ধি ঈশ্বরের কৃপা-দত্ত। মীরের ভবিষ্যদ্‌বাণী আংশিকভাবে সফল হয়েছিল বলা যেতে পারে। গালিবের কোন প্রথা-গত উস্তাদ্ বা গুরু জোটে নি। তাঁর সহজ-বুদ্ধিই ছিল তাঁর নির্দেশদাতা। তা সত্ত্বেও গালিব খুব বড় কবি হতে পেরেছিলেন।

খুব সম্ভব দিল্লীতে আসার পর গালিব তাঁর স্ত্রীর পিতৃকুলের সঙ্গেই বাস করতেন। ফার্সীতে লেখা একটি চিঠি থেকে জানতে পারা যায় যে তিনি কিছুদিন পর নিজে একটি বাড়ী কিনে সেখানে চলে যান। যাই হোক্, আমাদের জানা নেই যে কতকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর শ্বশুর ইলাহি বক্স খানের সঙ্গে বাস করেছিলেন। তবে এটা ঠিক যে শ্বশুরবাড়ীর আশ্রয় তাঁর পক্ষে

খুব সুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছিল।

ইউরোপে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহে 'সেলোং'এর মত তখনকার দিনে আমাদের দেশের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহেও একটি করে 'বৈঠকখানা' জাতীয় কক্ষ থাকত। এইগুলি ছিল শিল্পী, কবি ও পণ্ডিতদের মিলনকেন্দ্র। যাঁদের বাড়ীতে এই ধরনের আসর বসত, তাঁদের একটা নৈতিক দায়িত্ব ছিল এই-সব কবি, শিল্পী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের রক্ষা করা এবং তাঁদের জন্য সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করে দেওয়া। এই দায়িত্ব তাঁরা স্বেচ্ছায় বহন করতেন। বাল্যকালে গালিব দিল্লীতে চলে আসায় এবং একটি প্রভাবশালী ও সুপরিচিত পরিবারের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অতি অল্পকালের মধ্যেই গালিবকে দিল্লীর বিদগ্ধ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা দিয়েছিল। এই যোগাযোগ পরবর্তী কালেও তাঁর পক্ষে বিশেষ কাজে এসেছিল। এই সময় যাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুধী-পণ্ডিত, কবি, রাজনীতিজ্ঞ, রাজ-পুরুষ, ধর্মশাস্ত্রবিৎ ও সাধু-সন্ত শ্রেণীর ব্যক্তি। এঁরা পরবর্তী জীবনে সুখে-দুঃখে সর্বদা গালিবের পাশে এসে দাঁড়াতেন। এঁদের দ্বারা গালিবের প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছিল।

পেনসনের ঝগড়া

গালিব এখন বয়সে তরুণ, তাঁর উপর পরিবার-প্রতিপালনের দায়িত্বও এসে পড়েছিল। যতদিন গালিব আগ্রায় ছিলেন, তাঁর

জননীই তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। দিল্লী আসার পরও হয়তো তাঁর মা গালিবকে সাহায্য করতেন। যখন দরকার পড়ত তখন নবাব আহাম্মদ বক্স খানও তাঁকে অকাতরে অর্থ সাহায্য করতেন। অবশ্য এই সাহায্য পাওয়া যেত যখন-তখন এবং অনিয়মিত ভাবে। গালিবের স্থায়ী আয় ছিল বার্ষিক মাত্র 750.00 টাকা। তাঁর পারিবারিক মোট পেনসন বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে তাঁর নিজের প্রাপ্য অংশ। জ্যেঠা নসরুল্লা খানের মৃত্যুর পর ইংরেজ সরকার এই পারিবারিক 'পেনসন' মঞ্জুর করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই এই পেনসন প্রাপ্তির ব্যাপারে একটা বাধা উপস্থিত হল।

নবাব আহাম্মদ বক্স খানের তিন পুত্র ছিল। এদের মধ্যে বড় ছেলের নাম সামসুদ্দীন আহাম্মদ খান্। সামসুদ্দীন আহাম্মদ খানের সঙ্গে বাকী পরিবারের একটা ঝগড়া হয়েছিল। এই ঝগড়ার জন্য সমগ্র পরিবারের উপরেই সামসুদ্দীনের মনে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিশোধ-স্পৃহার সঞ্চার হয়েছিল। জ্যেষ্ঠ সন্তান, তাই তিনিই ছিলেন আহাম্মদ বক্স খানের স্বাভাবিকভাবে উত্তরাধিকারী। নবাবের ভয় হয়েছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর এই বড় ছেলের হাতেই চলে যাবে যত প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা। এর সুযোগ নিয়ে সামসুদ্দীন তাঁর ছোট দুটি ছেলেকে কষ্ট দেবে। এমনি একটি পরিণতি এড়াবার জন্য আহাম্মদ বক্স খান্ ব্রিটিশ সরকার ও নিজের পরিবারকে জানিয়ে নিজে 1826 খ্রীস্টাব্দে 'নবাবী' ছেড়ে দিলেন। নূতন ব্যবস্থায় সামসুদ্দীনকে ফিরোজপুর

ঝিরকা ও লোহারুর শাসক বা নবাব করা হল এই শর্তে যে লোহারু জায়গীরের আয় তাঁর দুই ছোট ছেলে পাবে, অর্থাৎ সামসুদ্দীন লোহারুর থেকে যা পাবেন সব ছোট দুই ভাইকে ছেড়ে দেবেন। এই ব্যবস্থার প্রভাব গালিবের নিজস্ব পেনসন বা আয়ের উপরও পড়ল। 1806 খ্রীস্টাব্দের ব্যবস্থামত তাঁর এবং তাঁর পরিবারের পাঁচ হাজার টাকার পেনসন আসত ফিরোজপুর ঝিরকা ও লোহারু জায়গীর দুটির রাজস্ব থেকে। 1826 খ্রীস্টাব্দের ব্যবস্থামত সামসুদ্দীনই হলেন টাকা দেওয়ার মালিক। সামসুদ্দীন তাঁর ছোট দু ভাইকে একেবারে পছন্দ করতেন না, এরা ছিল তাঁর দু' চোখের বিষ। গালিব ছিলেন এই ছোট দু' ভাইয়ের বন্ধু ও তাদের হিতৈষী। কাজেই তিনিও হয়ে উঠলেন সামসুদ্দীনের বিদ্বেষ-ভাজন। গালিবের নিজের অংশের নিয়মিত পেনসন প্রাপ্তির ব্যাপারে সামসুদ্দীন নানা বাধার সৃষ্টি করতে লাগলেন এবং পরিশেষে এটা একেবারে বন্ধ করে দিলেন।

একটি প্রেম-প্রসঙ্গ

প্রায় এই সময়েই গালিবের হৃদয়-ঘটিত একটি ঘটনার বিষয় আমরা জানতে পারি। এই ব্যাপারটি গালিবের হৃদয়ে একটি স্থায়ী ছাপ ফেলে গিয়েছিল। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল কম, পঁচিশের বেশী নয়, তিনি ছিলেন সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান, তাঁর আর্থিক অবস্থাও তখন মোটামুটি ভাল। যে সমাজে তিনি বাস করতেন

ও মেলামেশা করতেন সে সমাজে কোন একজনের প্রণয়িনী বা উপপত্নী থাকাটা আপত্তিজনক ছিল না, এমন-কি, তখনকার দিনে ভদ্রলোকদের মধ্যে কারো উপপত্নী ও প্রণয়িনী থাকাটা মর্যাদাসম্পন্ন মনে করা হত। তখনকার দিনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ্, ধর্মবেত্তা, উচ্চ-রাজপদাধিকারী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর মানুষের গৃহেই নর্তকী বা উপপত্নীরা স্থায়ীভাবে পরিবারভুক্ত হয়েই বাস করত। ধ্বংসোন্মুখ সমাজে মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধ প্রায়শঃই শিথিল হয়ে পড়ে। এই শৈথিল্যের কারণেই সমাজের মানুষেরা কুকাজে লিপ্ত থাকার সুবিধা ভোগ করে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পতনোন্মুখ হয়ে উঠেছিল। শেষদিকের মুঘল বাদশাহেরা যে অধিকার ও সম্মান জনসাধারণের কাছ থেকে পেতেন— তাঁরা তার উপযুক্ত ছিলেন না। তাঁদের পূর্বপুরুষদের যশোগৌরব স্মরণ করেই লোকে তাঁদের সম্মান করত। ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত যে-সব মুঘল সম্রাট রাজত্ব করে গিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন অতি উচ্চপ্রতিভাসম্পন্ন, দক্ষ প্রশাসক, বিশেষভাবে বুদ্ধিমান। এঁদের আর-একটি গুণ ছিল— এঁরা ছিলেন কাজের মানুষ— কর্মবীর পুরুষ। যখন যেমন প্রয়োজন তেমনিভাবে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার মতো যোগ্যতা তাঁদের সবারই ছিল। এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমাই শুধু বাড়ে নি, সাম্রাজ্যের গাঁথুনিও হয়েছিল খুব মজবুত, যেমনি ছিল এর শক্তি তেমনি ছিল

এর সমৃদ্ধি। রাজকোষে অর্থের ঘাটতি হত না, সৈন্যবাহিনী ছিল সুশিক্ষিত ও সন্তুষ্ট। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করে 'স্বাধীন' হয়ে যায়। রাজধানীর 'দরবারী' ব্যক্তিগণ বাদশাহের কাছ থেকে মুনাফা বা ক্ষমতা লাভের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে থাকে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এমনি ঝগড়া-বিবাদের ফলে দেশের মধ্যে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। তখনকার দিনে সকলেরই হাতে প্রচুর সময় ছিল কিন্তু কি করে এই সময়ের সদ্ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে কারো কোন ধারণা ছিল না। রাজনীতির খেলায় যাঁরা মত্ত হতেন তাঁদের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা পুঞ্জীভূত থাকত। কিছু সৎ লোকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবনে এই যুগে ধর্ম ও নৈতিকতার কোন স্থান ছিল না। এই অবস্থায় সবাই ভাবনা-চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়ে মদ্যপান, জুয়াখেলা অথবা নর্তকী-বিলাসে মত্ত হয়ে থাকতে চাইত।

আমাদের ঠিক জানা নেই গালিব যে রমণীর প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন তিনি কোন্ শ্রেণীর ছিলেন। বহু বৎসর পরে তাঁর লেখা একটি চিঠিতে প্রায় স্পষ্ট ভাবেই এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে। গালিব 'ডোমনী' এই নামে এঁর উল্লেখ করেছেন। 'ডোমনী' শব্দটির অর্থ একাধারে গায়িকা ও নর্তকী। আমাদের অনুমান যদি যথার্থ হয় তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গালিবের এই প্রেমাস্পদ অল্প বয়সেই মারা যান। কারণ গালিবের লেখা প্রথম জীবনের শায়রীগুলির মধ্যে একটা

মরমিয়া (শোক-গীতি) পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এটি এই প্রেমাস্পদের মৃত্যু উপলক্ষ্যেই রচিত হয়েছিল। এই মরমিয়াটির তাৎপর্য উদ্ধৃত হল :—

1. হায়, আমার বেদনায় তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছ
এই ব্যাকুলতা কেন ? হায়, তুমি তো এর আগে কখনও
ব্যাকুল হও নি।

2. তুমি যদি দুঃখ বেদনা সইতে নাই পার,
তবে, হায় কেন তুমি আমার সমব্যথী হয়েছিলে।

3. তুমি কোন্ খেয়ালে কেন বলো আমায় বন্ধুরূপে গ্রহণ
করেছিলে,
হায়, আমায় প্রণয়পাশে বেঁধে, তুমি যে নিজেই
তোমার শত্রু হয়েছ।

4. তুমি সারা-জীবন আমার প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে,
বলে কথা দিয়েছিলে,
কিন্তু হায়, তাতে লাভ কি, জীবন তো ক্ষণভঙ্গুর।

5. আমার কাছে চারিদিকের পরিবেশ বিষময় ঠেকে,
হায়, তোমার এটা মনঃপূত নয় যে।

6. তোমার রূপ-লাবণ্যের পুষ্প-দাম আজ কোথায় ?
হায়, তুমি যে তাকে ধুলায় মিলিয়ে দিয়েছ।

7. ভালবাসা লুকিয়ে রাখতে, কলঙ্ক থেকে বাঁচতে,
হায়, তোমার ধুলোর ঘোমটা পরার ব্যাপারটা বড়ই
বাড়াবাড়ি নয় কি।

8. ভালবাসার পবিত্র শপথ—ধুলায় মিলিয়ে গেল
হায়, ভালবাসার কথায় আর কে বিশ্বাস করতে চাইবে।

9. হায়, দারুণ আঘাত-হানার আগেই তরবারিধারীর
হাত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

10. বর্ষা-মুখর অন্ধকার রাত্রি কেমন করে কাটবে ?
হায়, আমার দুটি চোখ নক্ষত্র মণ্ডলীর মতই জেগে
থাকতে অভ্যস্ত সারা রাত ধরে।

11. কান শোনে না প্রণয়-বাণী, চোখ দেখে না সৌন্দর্য
হায়, হৃদয় আমার কেমন করে এই হতাশা সইবে ?

12. গালিব, প্রণয়ের গাঢ়তা তন্ময়তা ছোঁয় নি।
আমার ভালবাসার বাসনা সব কিছুই অপূর্ণ রয়ে গেল।

মনে হয়, গালিবের এই প্রণয়িনী সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া ছিলেন। এই কবিতাগুচ্ছ থেকে মনে হয় যে গালিবের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের বিষয়টি তাঁর পরিবারের কাছে বা লোকচক্ষে নিন্দিত হয়ে উঠতে পারে এই ভয়ে মহিলাটি আত্মঘাতী হয়েছিলেন। যদি এই মহিলাটি সাধারণ এক বার-নারী হতেন তবে একটা কলঙ্ক বা অসম্মানের ভয়ে তাঁর পক্ষে আত্মহত্যা করে পরিস্থিতি এড়ানোর প্রশ্নই আসত না। তরুণ বয়সের এই প্রণয় গালিবের মনে একটি স্থায়ী দাগ রেখে গিয়েছিল। তখনকার দিনের সামাজিক পরিবেশে এটা সম্ভব যে তিনি এমনি ধরনের আরো কিছু প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তবে এ সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি।

এই অব্যবস্থিত সামাজিক অবস্থায় গালিব তাঁর পারিপার্শ্বিকের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। তিনি মদ্য পান ও জুয়া খেলাতেও অভ্যস্ত হয়েছিলেন। আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকলে এই অভ্যাসগুলি বজায় রাখা যায় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই আর্থিক সচ্ছলতা তাঁর ছিল না। তাঁর মা যতদিন আগ্রায় জীবিতা ছিলেন সম্ভবতঃ ততদিন পর্যন্ত তিনি গালিবকে টাকাকড়ি জোগাতেন, এটা অবশ্যই স্বাভাবিক। আহাম্মদ বক্স খানের সঙ্গে গালিবের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল; গালিবের সম্বন্ধে নীতিগতভাবেও তাঁর কিছু কর্তব্য ছিল। এইসব কারণে মোটামুটিভাবে আহাম্মদ বক্স খানও তাঁর প্রয়োজন মিটাতেন। আহাম্মদ বক্স খান্ যখন তাঁর নবাবী গদির স্বত্ব ত্যাগ করেন, তখন কিন্তু অবস্থাটা খারাপ হয়ে গেল। গালিবের আর্থিক অবস্থা খুব শীঘ্রই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। তাঁর ধার-দেনার পরিমাণও ভারী হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় মানুষের স্বভাব এই যে একটা অজুহাত খুঁজে বের করা।

পেনসনের মামলা

আগেই বলা হয়েছে যে 1806 খ্রীস্টাব্দে গালিবের জ্যেষ্ঠতাত নসরুল্লা বেগের মৃত্যুর পর লর্ড লেক যে প্রথম আদেশ জারী করেন তার মর্ম ছিল এই যে মৃতের পরিবার বার্ষিক 10,000 টাকা পেনসন পাবে। পরে নবাব আহাম্মদ বক্সের চেষ্টায় এই

আদেশটি সংশোধিত ভাবে কার্য্যকরী হয়। এই সংশোধিত আদেশ অনুসারে ব্যবস্থা হয় দশহাজারের অর্ধেক পাবে এই পরিবার এবং বাকী অর্ধেক পাবেন কে একজন খাজা হাজী নামে ব্যক্তি। গালিব দ্বিতীয় এই সংশোধিত আদেশের কথা জানতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে পুরো বার্ষিক দশ হাজার টাকা পেনসনই তাঁর পরিবারের প্রাপ্য। তাঁর নিজের আর্থিক দুরবস্থা যখন চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তখন তার সহসা যেন মনে পড়ে গিয়েছিল যে দীর্ঘ দিন ধরে তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর অবিচার করা হয়েছে, বার্ষিক 10,000 টাকার পরিবর্তে তাঁরা পেয়ে এসেছেন মাত্র 5,000 টাকা। সব চেয়ে আপত্তির বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে কোনমতেই নসরুল্লা বেগের পরিবারভুক্ত বলে গণ্য করা যায় না তাকেও পেনসনের অংশ দেওয়া হচ্ছে। শুধু পেনসন দেওয়াই নয়, এর সিংহভাগটুকুই এই ব্যক্তি ভোগ করে নিচ্ছে। এই অন্যায় বা ভুল সংশোধনের জন্য গালিব সর্বপ্রথম নবাব আহাম্মদ বক্স খানের শরণাপন্ন হন। নবাব তাঁকে এই বলে শান্ত করেন যে তিনি ন্যায়বিচার যাতে হয় তার সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। নবাব এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট চেষ্টা না করায়, গালিব অধৈর্য হয়ে উঠলেন। তিনি সংকল্প করলেন যে কলকাতা গিয়ে তিনি সর্বোচ্চ সরকার অর্থাৎ ইংরাজের আদালতে নিজের দাবি পেশ করবেন। এই ভাতার ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ইংরাজ সরকারের একজন প্রতিনিধিই করেছিলেন। তিনি লর্ড লেক।

কলকাতা যাত্রা

1828 খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে গালিব কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বান্দা, এলাহাবাদ, বারাণসী, মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতা পৌঁছালেন। এই যাত্রাপথ ছিল দীর্ঘ ও কঠিন। পরের এপ্রিলেই তিনি গভর্নর জেনারেলের নিকট তাঁর প্রথম আবেদন পত্র পেশ করলেন। দরখাস্তে তিনি নিম্নলিখিত অনুরোধ জানান :—

1. 1806 খ্রীস্টাব্দের মে মাসে লর্ড লেক স্বর্গত নসরুল্লা খানের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য 10,000 টাকা বার্ষিক সাহায্য-ভাতা মঞ্জুর করেন। এই দশহাজার টাকার পরিবর্তে এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচহাজার টাকা দেওয়া হয়ে আসছে। অতএব পূর্বনির্ধারিত দশহাজার মুদ্রা পেনসনের ব্যবস্থা হোক।

2. এই সাহায্য-ভাতা বা পেনসন নসরুল্লা বেগ খানের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হয়েছিল। কিন্তু যাঁর সঙ্গে নসরুল্লা বেগ খান্ অথবা তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই এমন একজন বাইরের লোক (খাজা হাজী)-কে এই ভাতার একজন অংশীদার করে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যক্তির মৃত্যুর পর এঁর দুই পুত্রকে পিতার প্রাপ্য অংশের ভাগীদার করা হয়েছে। এটা বন্ধ করা হোক।

3. দশ হাজার টাকা মঞ্জুরীকৃত হয়েছিল; দেওয়া হচ্ছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। যে টাকা দেওয়া হয় নি তার যোগফল

ঠিক করে সমস্ত টাকা বাকী-বকেয়া সমেত এই পরিবারকে দেওয়া হোক। এই টাকার মধ্যে যেন খাজা হাজীকে ভুলক্রমে প্রদত্ত বার্ষিক 2000 টাকারও হিসেব ধরা হয়।

4. ভবিষ্যতে এই টাকা যেন ব্রিটিশের কোষাগায় বা ট্রেজারী থেকে দেওয়া হয়, এই টাকা এ যাবৎ ফিরোজপুর ঝিরকা রাজ্য থেকে দেওয়া হয়েছে।

নবাব আহাম্মদ বক্স খান্ 1827 খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মারা যান। গালিব এই সংবাদটি যাত্রাপথে মুর্শিদাবাদে শুনতে পান। কাজেই এই মামলার অপরপক্ষ দাঁড়ালেন নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সামসুদ্দীন আহাম্মদ খান্। এই ব্যক্তি পিতার জীবদ্দশাতেই ফিরোজপুর ঝিরকার নবাবী গদিতে আসীন হয়েছিলেন। গালিবের দরখাস্তের জবাবে সামসুদ্দীন লর্ড লেকের দ্বিতীয় আদেশটি পেশ করেন। এতে আগেকার 10,000 টাকার পরিবর্তে পাঁচ হাজার টাকা ভাতা নির্ধারিত হয়েছিল। 10,000 টাকার ভাতা ও বক্রী টাকার দাবি যে যুক্তিযুক্ত এটা প্রমাণিত করার জন্য গালিব এই অভিযোগ উত্থাপন করলেন যে, দ্বিতীয় হুকুমনামাটি জাল, কিম্বা কোন সন্দেহজনক উপায়ে এটি খাড়া করা হয়েছিল। তাঁর আরো বক্তব্য ছিল এই যে এই দ্বিতীয় হুকুমনামাটির কোন নকল দিল্লী কিম্বা কলকাতার সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত হয় নি। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য এই ছিল যে হুকুমনামাটি ফার্সীতে লেখা। প্রথামত এর উল্টো পিঠে লর্ড লেক বা অন্ততঃপক্ষে তাঁর সেক্রেটারীর সই থাকার কথা।

সামসুদ্দীন আহাম্মদ খান্ যে দ্বিতীয় হুকুমনামাটি পেশ করেন তাতে এমন কোন সই ছিল না। গালিবের মোট বক্তব্য এই দাঁড়িয়েছিল যে দ্বিতীয় হুকুমনামাটি জাল এবং এটির নির্দেশ নির্ভরযোগ্য নয়। তিনি আরো বলেছিলেন যে এই দ্বিতীয় হুকুমনামাটি আগেকার যে হুকুমনামায় বার্ষিক দশ হাজার টাকা ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে তা বাতিল করে দিতে পারে না, কারণ এটি লর্ড লেকের দ্বারা স্বাক্ষরীকৃত এবং এটা গভর্নর জেনারেল দ্বারা অনুমোদিত। এর একটি 'কপি' কলকাতার আপিসে রেকর্ডভুক্ত হয়ে আছে।

গালিবের যুক্তিগুলি এতদূর তথ্য-সম্মত ও সুসংগত ছিল যে ভারত সরকারের মুখ্য সচিব জর্জ সুইনটন এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে নবাবের প্রদর্শিত হুকুমনামাটি জাল এবং গালিবের দাবিই মেনে নেওয়া উচিত। যখন আলোচ্য জায়গীর ও ভাতা ইত্যাদি প্রদত্ত হয়েছিল তখন সার জন ম্যাল্কম ছিলেন লর্ড লেকের সচিব। ইনি গালিবের এই মামলা চলার সময়ে বোম্বাই প্রদেশের ছোটলাটের পদে আসীন ছিলেন। এইজন্য এই দ্বিতীয় হুকুমনামাটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য চাওয়া হয়েছিল। গালিবের যুক্তিগুলি সংগত ভাবে খণ্ডন না করে সার জন ম্যালকম্ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে নবাব আহাম্মদ বক্স খান্ একজন অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, তার উপর তিনি ছিলেন লর্ড লেকের বিশেষ আস্থা-ভাজন। এ হেন ব্যক্তি যে একটা হুকুমনামা 'জাল' করবেন এটা কল্পনাতীত।

এই অজুহাতে সার জন এই মত প্রকাশ করেন যে হুকুমনামাটি বিশ্বাসযোগ্য এবং সাক্ষ্য হিসাবেও গ্রহণযোগ্য। সার জনের এই অভিমত পাওয়ার পর সপারিষদ গভর্নর জেনারেল স্থিতাবস্থার কোন পরিবর্তনে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। এক কথায় বলা যায় গালিব তাঁর মামলাটিতে হেরে গেলেন।

সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের এই অভিমত পাওয়ার জন্য গালিব কলকাতায় আর কালক্ষেপ করেন নি। কলকাতা থেকে যাত্রা করে 1829 খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে তিনি দিল্লী ফিরে আসেন। যে উদ্দেশ্যে কলকাতায় যাওয়া তা সফল না হলেও একাধিক কারণে এই কলকাতা-বাসের অভিজ্ঞতা গালিবের জীবনে একটি দিক্‌চিহ্ন স্বরূপ দেখা দিয়েছিল।

কলকাতা— সাহিত্য-বিসম্বাদ

গালিবের কলকাতা আসার কিছু পরেই কলকাতা কলেজের সাহিত্যিক সমাজ একটি সাহিত্য-গোষ্ঠী ও মুশায়রার আয়োজন করেন। গালিব এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি স্বরচিত দুটি ফার্সী গজল পাঠ করেন। কলকাতার তদানীন্তন কবি-সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই ছিলেন হয় মুহম্মদ হসন কতীল-এর শিষ্য অথবা তাঁর অনুরক্ত ভক্ত। কতীলের ভাবধারা বা শৈলী অনুযায়ী গালিবের এই গজলের বিরোধী আলোচনা তাঁর গজল পাঠের পর উত্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয়

ফার্সী-পণ্ডিতদের কারো প্রতি গালিব শ্রদ্ধা পোষণ করতেন না। তাঁর অভিমত এই ছিল যে গভীর অধ্যয়ন ও কঠোর পরিশ্রমে যে-কোন ভাষা আয়ত্ত করতে পারা অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু কোন ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও মুহাবরা সম্বন্ধে আদর্শ কী হবে সে সম্বন্ধে মত দেবার অধিকারী তাঁরাই যাঁদের এটি মাতৃভাষা। যে দেশের ভাষা সে দেশের বাইরের কেউ এ ভাষার যতবড় পণ্ডিত রূপেই খ্যাত হন না কেন ব্যবহৃত ভাষা ভাল কি মন্দ হয়েছে সে বিষয়ে তাদের মত যে গ্রহণযোগ্য হতেই হবে, এমন হতে পারে না। কতীল ছিলেন ভারতবাসী। এইজন্য তাঁর কোন বিচার-ধারা অথবা রচনাকে প্রামাণিক রূপে গ্রহণ করে সেই নিরিখে তাঁর (অর্থাৎ গালিবের নিজের) রচনা ভাল কি মন্দ এ বিচারের অধিকার কারো নেই। কার্যতঃ কতীল সম্বন্ধে তিনি কটূক্তিই করেছিলেন। এই সাহিত্য-সভার শ্রোতৃবৃন্দ কতীলকে একজন খুব বড় কবি ও ফার্সী ভাষার একজন পণ্ডিত রূপে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। সুতরাং গালিবের এই মন্তব্যে সবাই খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, ফলে গালিবকে কঠোর নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গালিবকে মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে এই-সব বিরুদ্ধ সমালোচনার জবাব দিতে হয়েছিল। এই বিরোধিতা কালক্রমে স্তিমিত হয়ে এসেছিল কিন্তু একেবারে মিলিয়ে যায় নি। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি গালিবের সাহিত্যজীবনে স্থায়ীভাবে বিরূপ ছায়াপাত করেছিল। তবে এতে তাঁর মতের অবশ্য কোন পরিবর্তন ঘটে নি। ভারত-জাত ফার্সী পণ্ডিতদের প্রতি তাঁর

ঘৃণা ও উপেক্ষার মনোভাব তাঁর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিই পেয়েছিল, হ্রাস পায় নি।

কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রভাব

গালিবের কলকাতা-ভ্রমণের পরিণাম এই একটা হয়েছিল যে এই ভ্রমণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই পালটে গিয়েছিল। এই পরিবর্তন তাঁর মানসিকতা গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। তখনকার দিনের কলকাতা ছিল ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শহর। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে, এখানে বহু আধুনিক ও নবীনতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর নানা দিক-দেশ থেকে নানান পণ্যসম্ভারে বোঝাই জাহাজগুলি কলকাতা বন্দরে এসে ভিড়ত। সেখানে সর্বদাই একটা কর্মচাঞ্চল্য বিরাজ করত। কলকাতা-প্রবাসী ইংরাজেরা কলকাতার প্রাচ্যদেশ-সুলভ অনড় ও শ্লথগতি পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অনেকাংশে বদলে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে বহু উর্দু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে কিছু ছিল মৌলিক রচনা, কিছু ইংরেজী বা অন্য কোন প্রাচ্য ভাষা গ্রন্থের অনুবাদ। এই উর্দু রচনাগুলি উর্দু গদ্যের একটি নূতন গতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। কলকাতায় বহু ইরাণ-দেশীয় ব্যবসায়ী বা পর্যটকের বাস ছিল। গালিব এঁদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে

আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সম্পর্ক থেকে তিনি আধুনিক ফার্সী ভাষার জ্ঞানও অর্জন করতে পেরেছিলেন। এই ধরনের মেলামেশা ও বাতাবরণের প্রভাবে গালিবের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু সাহিত্যের ব্যাপারেই নয় অন্য ক্ষেত্রেও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁর পাল্‌টে গিয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে যে, গালিব যে মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে দীর্ঘ ও কষ্টকর পথ ধরে কলকাতায় এসেছিলেন তা সফল হয় নি। তবে তাঁর যাত্রা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। কলকাতা-ভ্রমণ তাঁর সাধারণ-জ্ঞান ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে মার্জিত করেছিল— এতে তিনি লাভবানই হয়েছিলেন। ফার্সী ভাষার প্রভাবে, গালিবের যুগ পর্যন্ত উর্দু ভাষা ছিল একটু বেঢপ, ফার্সী শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গির প্রভাবে আড়ষ্ট। এটা অবশ্য স্বাভাবিকই ছিল, কারণ তখনকার দিনের উর্দু লেখকেরা সকলেই ছিলেন ফার্সী পড়ুয়া, এঁরা অবস্থার চাপে পড়ে উর্দু লিখতে বাধ্য হতেন, না লিখে উপায় ছিল না। তবে এঁরা এই নূতন ভাষার প্রতি বেশ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না, তাই এঁদের উর্দু রচনায় দরদের অভাব থেকে যেত। এঁদের বেশীর ভাগ রচনা ফার্সীতেই লেখা হত। এঁরা উর্দুতে যখন লিখতেন তখন এঁরা ফার্সীর প্রভাবটি কাটিয়ে উঠতে পারতেন না।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগই সর্বপ্রথম উর্দু গদ্যে একটি নূতন শৈলী এনে দিতে পেরেছিল। ইংলণ্ডের যে-সব

তরুণেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকুরী গ্রহণ করে এ দেশে কেরানী বা 'রাইটার' হয়ে আসত তাদের পাঠোপযোগী পুস্তকের জোগান দেওয়াই ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-প্রকাশিত উর্দু গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য। গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যেই রচিত হত। এই কর্মচারীদের পক্ষে রাজকার্য পরিচালনের জন্যই উর্দু শিখতে হ'ত কারণ এটাই ছিল দেশের অধিকাংশ মানুষের কথা-বার্তা ও ভাব-বিনিময়ের ভাষা। লর্ড ওয়েলেসলী এই কলেজটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইংলণ্ড থেকে সদ্য-আগত 'রাইটার'দের এই কলেজে উর্দু শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানের কবি ও লেখকদের নিযুক্ত করা হত। এঁরা ফার্সী বা আরবী ভাষার বই উর্দুতে অনুবাদ করতেন অথবা মৌলিকভাবে উর্দুতেই বই লিখতেন। এই বইগুলির ভাষা যাতে সরল ও কথ্যভাষার মতই হয় সেদিকে নজর দেওয়া হত, এর প্রয়োজনও ছিল। মনে হয় যে, গালিব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত এমনি সরল ও সাবলীল ভাষায় রচিত কিছু উর্দু গদ্যের বই পড়েছিলেন। অনেকে মনে করেন যে গালিব ইংরাজী পত্র-লিখন-পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই ধরনের পদ্ধতি হল প্রচলিত উর্দু ও ফার্সী রীতির থেকে ভিন্ন। ইংরাজী পত্রে— সোজাসুজি বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়। প্রচলিত ফার্সী ও উর্দু পত্র-লিখন-পদ্ধতি হল বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রস্তাবনা যুক্ত। গালিব ইংরাজী পত্র-লিখন-পদ্ধতির অনুসরণ করতেন এই ধারণাটি ঠিক

নয়। কলকাতা যাত্রার বহু পূর্ব থেকেই পুরোমাত্রায় ফার্সী রচনায় নিরত গালিব চিঠিপত্র লেখার কাজে ফার্সী ধরনের দীর্ঘ প্রস্তাবনা ফাঁদার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন। শুধু তাই নয়, অপ্রয়োজনীয় বন্ধন থেকে ভাষাকে মুক্তি দেওয়াও তিনি সমর্থন করতেন। যাই হোক, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-প্রবর্তিত সিধা ও সরল উর্দু গদ্য শৈলীর সঙ্গে পরিচয় লাভ করে গালিব উপকৃতই হয়েছিলেন। লম্বা-চওড়া শব্দাবলীযুক্ত অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর যা তিনি অপছন্দ করতেন, ফোর্ট উইলিয়ম-প্রবর্তিত উর্দু শৈলীও সেই দোষ থেকে মুক্ত ছিল। এই ব্যাপার থেকে তাঁর নিজস্ব মতটি আরো পরিপুষ্ট হতে পেরেছিল।

1829 খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে গালিব দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

সামসুদ্দীন আহাম্মদ খানের জীবনান্তে

গালিবের দিল্লীতে অনুপস্থিতি কালে ঘটনাস্রোত দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে নবাব আহাম্মদ বক্স খান্ 1827 খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মারা যান। এই ঘটনার পর নবাব সামসুদ্দীন আহাম্মদ খান্ ফিরোজপুর ঝিরকা ও লোহারু এই দুই জায়গীরের গদিতে বেশ পাকা ভাবে উঠে বসলেন। নিজের ছোট দুই ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর পুরানো ঝগড়া মিটে যাওয়া দূরে থাক্ তা আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল। সামসুদ্দীন নিত্য

নূতন এমন সব নানা বাধার সৃষ্টি করতে থাকলেন যার ফলে এই দুই ভাইয়ের পক্ষে পৈত্রিক উত্তরাধিকার ভোগ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। গালিব মামলা দায়ের করার ফলে ফিরোজপুরের 'খাজনা' থেকে তাঁর 'পেনসন' একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এসব ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করেই সামসুদ্দীন ক্ষান্ত থাকেন নি। ব্রিটিশ প্রতিনিধি মিঃ উইলিয়ম ফ্রেজারের সঙ্গেও নবাবের দারুণ মনোমালিন্য ঘটেছিল। এর পরিণাম খুবই অশুভ হয়েছিল। 1835 খ্রীস্টাব্দের 22শে মার্চ ফ্রেজার যখন একটা নৈশাহারের নিমন্ত্রণ সেরে কাশ্মীর গেটের বাইরে উচ্চভূমির উপর অবস্থিত নিজের বাসস্থানে ফিরছিলেন তখন তাঁকে গুলি করে নিহত করা হয়। এই খুনের অনুসন্ধানের ফলে করিম খাঁ নামে নবাবের এক কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে তাকে এই খুনের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। আর একটু তদন্তের পর অনেক নূতন তথ্য বেরিয়ে পড়ে। দেখা গেল, নবাব স্বয়ং এই হত্যা-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। এর ফলে নবাব এবং করিম খাঁ দুজনেরই বিচার আরম্ভ হয়। আসল হত্যাকারীকে 1835 খ্রীস্টাব্দের 26শে আগস্ট ফাঁসি দেওয়া হয়। এইসঙ্গে বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত ঘটনাটি কলকাতায় গভর্নর জেনারেলকে জানিয়ে এই সুপারিশ করেন যে এই হত্যার প্ররোচনা-দাতা নবাবেরও মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। সপারিষদ গভর্নর জেনারেল দিল্লীর ম্যাজিস্ট্রেটের এই সুপারিশ অনুমোদন করায় এই বছরের 8ই অক্টোবর নবাবকেও ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়।

এই ঘটনাটিতে পরিস্থিতির বেশ পরিবর্তন এসেছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই আহাম্মদ বক্স খানকে ফিরোজপুর ঝিরকা জায়গীর বখ্‌শিশ দিয়েছিলেন। আহাম্মদ বক্স খানের উত্তরাধিকারী সামসুদ্দীনের ফাঁসির পর এই জায়গীর ইংরেজ সরকার স্বয়ং গ্রহণ করলেন। লোহারু জায়গীরটি আলোয়ারের মহারাজার দান— এটি অবশ্য নবাব-পরিবারের হাতেই থেকে গিয়েছিল। সামসুদ্দীনের অনুজ আমিনুদ্দীন আহাম্মদ খান্ এখন থেকে লোহারুর নবাবের গদিতে আসীন হলেন। ঠিক হয়েছিল যে তিনি জায়গীরের অর্ধেক লভ্যাংশ তাঁদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই জিয়াউদ্দীন আহাম্মদ খানকে দেবেন— কারণ তিনিও ছিলেন এই সম্পত্তির অন্যতম অংশীদার। এখন থেকে গালিবের পেনসন দেবার ভার পড়েছিল দিল্লীর কালেক্টরীর উপর।

পেনসনের পরিমাণ বার্ষিক 10,000 টাকা নির্ধারিত হোক এই মর্মে গালিবের যে মামলা সপারিষদ গভর্নর জেনারেল নাকচ করে দিয়েছিলেন, গালিব তার বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন। অবশেষে 1842 খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই আপিলটিও রদ করে দেন। গালিব এর পরেও তাঁর মামলা নূতন নূতন যুক্তি দিয়ে জেতার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তা সাফল্য লাভ করে নি। 1844 খ্রীস্টাব্দে গালিব তাঁর পরাজয় চূড়ান্তরূপে মেনে নিয়েছিলেন।

এই মামলার সূচনায় তাঁর একটি দাবি এই ছিল যে ভবিষ্যতে তাঁর পেনসন ফিরোজপুর ঝিরকা স্টেটের পরিবর্তে ব্রিটিশ

কোষাগার থেকে দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা অনেকটা ঘটনা-চক্রেই হয়ে গিয়েছিল। কারণ সামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর নবাব বা ঝিরকা এস্টেট্—এই দুয়েরই অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল। তাঁর আর-একটি আবেদন এই ছিল যে গভর্নর জেনারেলের রাজসভা বা দরবারে তাঁর নিমন্ত্রণ হবে এবং তাঁকে 'খিলঅত' বা রাজ-পোষাক দ্বারা সম্মানিত করা হবে। এর প্রথম অনুরোধটি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে গালিব যখন কলকাতায় ছিলেন তখনই স্বীকৃত হয়। 'দরবারী পোষাক' পাওয়ার অনুরোধটি লর্ড এলেন বরোর (1842-44) শাসনকালে মঞ্জুর করা হয়। এই সময়ে তাঁর পেনসনের মামলাটি যবনিকা-পাতের অপেক্ষায় ছিল।

গালিবের পেনসনের মামলাটি 15 বছর ধরে চলেছিল। গালিবের স্বল্প আযের অনেকটাই এই মামলা শুষে নিয়েছিল। এই মামলার খরচ চালানোর জন্য তাঁকে চোটা-সুদে বহু টাকা ধার করতে হয়েছিল। এই দেনা শোধ করতে গালিবকে পরবর্তী কালে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল।

মুঘল দরবারের সঙ্গে সম্পর্ক

আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও সাহিত্য-জগতে গালিব এই সময়ে বেশ উচ্চস্থানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। মুঘল দরবারে তাঁর প্রবেশ লাভ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ তথ্য আমাদের জানা নেই। গালিব যখন আগ্রা থেকে দিল্লীতে বাস করতে আসেন তখন লাল কেল্লার রাজ সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত ছিলেন দ্বিতীয় আকবর শা। দিল্লী আসার পর খুব সম্ভব গালিব নবাব আহাম্মদ বক্স খানের পরিবারের সঙ্গে বাস করতেন। এটা নিশ্চিত যে এই নবাব শুধু দিল্লী-দরবারের সঙ্গে পরিচিতই ছিলেন না, দরবারে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিও বেশ ছিল। এটা বেশ ধরে নেওয়া যায় যে নবাব আহাম্মদ বক্সই গালিবকে বাদশাহী দরবারের সঙ্গে পরিচিত করে দেন। প্রথম দিকে, গালিব বাদশার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেছিলেন। গালিবের ফার্সী দিওয়ানে দ্বিতীয় আকবর শাহের প্রশংসামূলক একটি 'কসীদা' দেখতে পাওয়া যায়। এই 'কসীদা'র শেষ অংশে বাদশার উত্তরাধিকারী যুবরাজ সলীমেরও উল্লেখ আছে। বাদশার অনুগ্রহ লাভের এই প্রয়াস সম্ভবতঃ ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় আকবর শা কিছু কবিতা রচনা করলেও শিল্প-সাহিত্য প্রেমিক ছিলেন না। গালিব এইজন্যই তাঁকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আকবর শাহ্ 1837 খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্। এই নূতন বাদশাহ উর্দু ভাষায় শুধু পারদর্শীই ছিলেন না, একজন বিশিষ্ট কবি হিসাবে উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি একটি স্থায়ী আসনও দাবি করতে পারেন। তিনি 'জাফর' এই ছদ্ম-নামে কাব্য-রচনা করতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, গালিব এঁর দরবারেও ঢুকতে পারেন নি। বাদশাহী গদিলাভের কোন আশা নেই জেনে দ্বিতীয় বাহাদুর শা প্রথম জীবনেই সময় কাটানোর উপায় হিসাবে কবিতা লেখা শুরু করেন। কাব্যসাধনার শুরুতে

প্রসিদ্ধ উর্দু শায়র নসীর ছিলেন এঁর 'ওস্তাদ' ও পথ-প্রদর্শক। মহারাজা চণ্ডূলালের আহ্বানে যখন নসীর দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ চলে যান তখন 'জাফর' কাজিম আলি বেকার নামে একজন কবির পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তবে এঁদের দুজনের সহযোগিতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। 1808 খ্রীস্টাব্দে মন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের সৈন্যবাহিনীতে অনুবাদকের চাকরী নিয়ে বেকরার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চলে যান। মন্টস্টুয়ার্ট এলফিন-স্টোন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কাবুলের আমীরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সন্ধিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বেকরার চলে যাওয়ার পর জাফর মহম্মদ ইব্রাহিম জৌক নামে এক তরুণ কবির সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন, ইনি তখনকার দিনে খুব দ্রুত সাহিত্যজগতে খ্যাতি-মান্ হয়েছিলেন।

দেখা যাচ্ছে যে, দিল্লীর দরবারে কবি রূপে প্রতিষ্ঠা বা প্রবেশলাভের সম্ভাবনা গালিবের দিল্লী আগমনের আগে থেকেই রুদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তী কালে বাদশাহের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টার পথে শুধু জৌক বা তাঁর দলের বিরোধিতাই তাঁর পক্ষে একমাত্র বাধা ছিল না। দ্বিতীয় আকবর শাহ্ ও তাঁর পুত্র সেলিমের প্রশস্তিসূচক যে 'কসীদা' গালিব ইতিপূর্বে লিখে-ছিলেন সেটিও হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি মস্ত বাধা। দ্বিতীয় আকবর শাহ্ তাঁর পুত্র সেলিম উভয়েই দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সিংহাসন প্রাপ্তির সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন।

গালিব স্বীয় যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন। জৌক ও তাঁর দলভুক্ত শায়রদের হাতে নিজের পরাজয় গালিবকে সম্ভবতঃ বেশ পীড়িত করেছিল। গালিবের জীবন প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংঘর্ষে কেটেছিল। অতি অল্প বয়সে, যখন তিনি শিশু তখন গালিবের বাবা মারা যান, তারপর মারা যান জ্যেঠা। দীর্ঘকাল তাঁর জীবনে নিরাপত্তা ছিল না, বেঁচে থাকার জন্য অপরের অনুগ্রহের উপর তাঁকে নির্ভর করে থাকতে হ'ত। যখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন তখন দেখলেন তাঁর পরিবারের ন্যায্য প্রাপ্য অন্যে ঠকিয়ে ভোগ করেছে। এর প্রতিকারের জন্য তিনি আইনের আশ্রয় নিলেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর মামলা চলেছিল। বহু অর্থব্যয় ও সময় নষ্ট যখন হয়ে গিয়েছে তখন মামলায় তাঁর হার হল। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে এই-সব অকরুণ অভিজ্ঞতা গালিবের মনে সেই সমাজ সম্বন্ধে একটা বিদ্রোহী মনোভাব এনে দিয়েছিল যে সমাজ এমনি অন্যায়ের সমর্থক।

এমনি প্রতিকূল বৈষয়িক অবস্থাতেও কোন মানুষ তার বুদ্ধি অথবা নৈতিক গুণাবলীর যথোচিত স্বীকৃতি পেলে তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়, সে কিছুটা আত্ম-প্রসাদের স্বাদ অনুভব করতে পারে। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের দরবার নগণ্য এবং বিশেষ গুরুত্বহীন হওয়া সত্ত্বেও এইটাই ছিল তৎকালে একমাত্র জায়গা যেখান থেকে স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব ছিল। ঠিক সময়মত এই ঠিকানায় পৌঁছাতে না পারায় গালিব এই স্বীকৃতি থেকেও

বঞ্চিত হয়েছিলেন। এটা আশ্চর্য হবার মত ঘটনা নয়, যে এই কারণগুলির জন্য সমসাময়িক সাহিত্য-জগৎ সম্বন্ধে গালিবের মনে একটা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। এই মনোভাবের ফলে গালিবের লাভও হয়েছিল আবার ক্ষতিও হয়েছিল। লাভ হল এই যে তিনি আর কারো সাহায্যের প্রত্যাশা না করে নিজের চেষ্টায় উপরে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। ক্ষতি হয়েছিল এই যে তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারেন নি।

উর্দু দীওয়ান

শাহী দরবারে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিলাভে গালিব ব্যর্থ হয়েছিলেন এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও বহু লোকে তাঁর শক্তি-মত্তায় আস্থাবান হয়েছিলেন। এঁরা তাঁকে খুব উঁচুদরের কবি বা লেখক রূপে মেনে নিয়েছিলেন। ধীর এবং নিশ্চিত পদ-ক্ষেপে গালিব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এক দল সুধী-পণ্ডিত ও কাব্য-রসিক মহলের সমর্থন লাভে তিনি কৃতকার্য হয়েছিলেন। একজন বন্ধুর পরামর্শে গালিব তাঁর উর্দু দীওয়ানগুলি সংশোধনের কাজে হাত দেন। এই সংশোধনকালে তিনি অর্থ-দুষ্ট ও সুপ্রযুক্ত নয় এমন কতকগুলি পদ্য ছেঁটে ফেলেছিলেন। 1841 খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম তাঁর উর্দু 'দীওয়ান' প্রকাশিত হয়েছিল। এই ছোট্ট পুস্তকটিতে 1100 'শায়ের' সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

আর্থিক কৃচ্ছ্রতা

একজন বড় কবি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া আর সচ্ছলতার সঙ্গে আরামে দিন যাপন করা একই ব্যাপার নয়। গালিবের ব্যয় ছিল প্রায় সব সময়েই তাঁর আয়ের অনুপাতে বেশী। যতদিন মা বেঁচেছিলেন ততদিন গালিব তাঁর কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য পেতেন। গালিবের মা ঠিক কোন্ সময়ে মারা যান সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন সংবাদ জানা যায় না। তবে কিছু সংযোগাত্মক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় এই দুঃখদায়ক মৃত্যুটি ঘটেছিল 1840 খ্রীস্টাব্দে। স্বাভাবিক কারণে মায়ের মৃত্যুর পর গালিবের এই আয়ের সূত্রটি ছিন্ন হয়েছিল। নবাব আহাম্মদ বক্স খানের দেহান্ত হয় 1827 খ্রীস্টাব্দে। তাঁর কাছ থেকে যা-কিছু সাহায্য পাওয়া যেত সেটাও এর পর বন্ধ হয়ে যায়। পেনসনের জন্য দীর্ঘস্থায়ী মকদ্দমায় তাঁর আর্থিক অবস্থার শুধু অবনতিই ঘটেনি, ঋণের অঙ্কও স্ফীত করে তুলেছিল। কাজেই গালিব এবং তাঁর বন্ধুদের পক্ষে তাঁর জন্য কিছু বাড়তি আয়ের পথ খোঁজা অতি আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। এই বাড়তি আয়ের সাহায্যেই গালিবের দুর্দশা হ্রাস সম্ভবপর ছিল।

দিল্লী কলেজের ঘটনা

1840 খ্রীস্টাব্দে এই বাড়তি আয়ের একটা সুযোগ এসেছিল কিন্তু গালিব এই সুযোগ লাভ করতে পারেন নি। জেমস্ থাঁমসন ছিলেন দিল্লী কলেজের একজন ‘ভিজিটর’ বা

পরিদর্শক। ইনি এই সময়ে কলেজ পরিদর্শনে এসে মন্তব্য করেন যে কলেজে ফার্সী শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা অসন্তোষজনক। তিনি এই পরামর্শ দেন যে ফার্সী শিক্ষাদানের ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। তাঁকে কোন-এক ব্যক্তি জানিয়েছিলেন যে দিল্লীতে তিন জন এমন ব্যক্তি আছেন যাঁরা ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত। এই তিনজন হলেন গালিব, প্রসিদ্ধ উর্দু কবি মোমিন ও সুপরিচিত ফার্সী-পণ্ডিত ইমাম বক্স সহবাই— এই তিনজনের মধ্যে কোন-একজনকে উত্তম ফার্সী শিক্ষা দানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা যেতে পারে। থাঁমসন ভারত-গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী রূপে গালিবকে আগে থেকেই জানতেন। সরকারী দরবারে গালিবের নিমন্ত্রণ হত কারণ তিনি আগে থেকেই 'কুর্সী-নসীন' অর্থাৎ দরবারে আসন-লাভ-যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এই কারণে গালিবের সঙ্গে তাঁর মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎও ঘটত। কাজেই থাঁমসন সর্বপ্রথম গালিবকেই আহ্বান জানান। থাঁমসনের আমন্ত্রণ পেয়ে গালিব প্রথামত পাল্কীতে চড়ে তাঁর বাড়ী যান। সেখানে পৌঁছে, তিনি বাড়ীর গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন এই আশায় যে কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাবে। গভর্নর জেনা-রেলের দরবারে আমন্ত্রণ পান এমন ব্যক্তিদের এইভাবে অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাওয়াই প্রথাসিদ্ধ। এটা ধরে নেওয়া যায় যে এর আগে গালিব যখনই থাঁমসনের সঙ্গে দেখা করার জন্য গিয়েছেন তখন তাঁকে এইভাবে অভ্যর্থনা

করে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবার কিন্তু তা হ'ল না। গালিব বাড়ীর গেটের সামনে অপেক্ষা করতে লাগলেন কিন্তু কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা-সহকারে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে এল না। কিছুক্ষণ পর থাঁমসন নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জানতে চাইলেন গালিব কেন পাল্কী থেকে নেমে বাড়ীর মধ্যে আসছেন না। কারণটা কি? গালিব যখন তাঁর অসুবিধায় কথাটা জানালেন তখন থাঁমসন তাঁকে বললেন যে দরবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরূপে তাঁকে যে সম্মান দেখানো হয় সেটা আনুষ্ঠানিক রূপে দরবারকালেই তাঁর প্রাপ্য। এখন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন দিল্লী কলেজে একটা চাকুরী প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে। দরবারী ব্যক্তির প্রাপ্য সম্মান দরবার উপলক্ষ্যেই শুধু দেওয়া হয়ে থাকে। এই জবাবে গালিবের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হ'ল। গালিব বললেন যে তিনি থাঁমসন সাহেবের কাছে দিল্লী কলেজের চাকুরীর জন্য এসেছিলেন এই আশায় যে এই চাকুরী দেশের লোকের এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। এই চাকুরী নেওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে, যে সম্মান তিনি পাচ্ছেন তা আর পাবেন না, তাহলে এই চাকুরী গ্রহণের চেয়ে বর্জনই তাঁর পক্ষে বাঞ্ছনীয়। এই কথাগুলি বলে গালিব তাঁর পাল্কীতে উঠে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এই ঘটনাটি থেকে গালিবের মানসিক চরিত্র কী ধরনের ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায়। 1806 খ্রীস্টাব্দে যখন তাঁর জ্যেঠামশায়ের মৃত্যু হয় তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ন বছর। এই সময় থেকে

তিনি ব্রিটিশ সরকারের পেনসনভোগী ছিলেন। যখনই তিনি সরকারী দরবারে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিয়েছেন তখনই তিনি দরবারের মুখ্য ব্যক্তির প্রশস্তিমূলক 'কসীদা' রচনাও আবৃত্তি করে এসেছেন। ফার্সীভাষার 'ওস্তাদ' এবং অদ্বিতীয় পণ্ডিত হিসাবে গালিবের মনে বেশ অভিমান ছিল। তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক ছিল না। এই অবস্থায় সাধারণ ভাবে যে কেউ একজন আশা করতে পারত যে গালিব এই সুযোগ হাতছাড়া করবেন না, কলেজের চাকুরীটি গ্রহণ করবেন। এতে শুধু তাঁর ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকেরা খুশি হবেন তা নয়, তাঁরা তাঁকে ফার্সী ভাষায় একজন পণ্ডিত রূপেও প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। সর্বোপরি ব্রিটিশের সহায়তায় তাঁর অর্থকৃচ্ছ্রতারও অবসান হবে। এতগুলি সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও গালিব ঔদ্ধত্য সহকারে এই চাকুরী প্রত্যাখ্যান করে এসেছিলেন ভবিষ্যতের ভাবনা এতটুকু চিন্তা না করে। এর কারণটা তুচ্ছই। কি-না থাঁমসনের বাড়ী যখন তিনি যান তখন তিনি তাঁকে অভ্যর্থনা সহকারে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যেতে এগিয়ে আসেন নি। এর থেকে বোঝা যায় যে গালিব কতখানি আত্মাভিমানী ছিলেন আর তাঁর আত্মমর্যাদাজ্ঞানই বা কত বেশী ছিল। সর্বাবস্থায় গালিব নিজের গর্ববোধ ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করে চলতেন।

জুয়া খেলার জন্য জেল বাস

আত্মাভিমান ও অহংকার গালিবের থাকলেও তাতে তাঁর অর্থ-কষ্ট দূর হয় নি। এই সমস্যাটি তাঁর থেকেই গিয়েছিল।

অল্প বয়স থেকেই গালিব দাবা ও 'চৌসর' অল্প বাজি ধরে খেলতে অভ্যস্ত ছিলেন। মনে হয় এই অর্থ-সংকটের সময়ে একটু বেশী করেই তিনি এই জুয়া খেলায় নিজেকে লিপ্ত করেছিলেন। তাঁর এই খেলার সঙ্গী ছিলেন শহরের কিছু ধনী ব্যবসায়ী ব্যক্তি, এঁরা নিয়মিত ভাবে গালিবের বাড়ীতে এসে জুয়া খেলার জন্য মিলিত হতেন। এটা বেশ বোঝা যায়, যে এই জুয়া খেলায় গালিব জিতে কিছু অর্থ রোজগার করতেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষের বেশ জানা ছিল যে জুয়া খেলার প্রকোপ শহরে বেড়েই চলেছে। সমাজ-দেহের ক্ষতের মতই এটা অনিষ্ট-কর ভেবে এঁরা এটা দূর করার চেষ্টায় ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক দিনই একটা না একটা জুয়ার আড্ডায় হানা দিয়ে পুলিশ জুয়াড়ীদের ধরে ফেলত, তারপর তাদের সাজা দেওয়া হত। শহরের কোতোয়াল ছিলেন গালিবের ব্যক্তিগত এক বন্ধু, সাহিত্যেও এঁর অনুরাগ ছিল; গালিবকে ইনি বাঁচিয়ে দিতেন, পুলিশ তাঁর উপর হামলা করত না। এই ভদ্রলোক একসময় বদলী হয়ে গেলে তাঁর জায়গায় কোতোয়ালের পদে এলেন ফয়জুল হাসান খান নামে এক নূতন ব্যক্তি। সাহিত্যের প্রতি এঁর কোন আসক্তি ছিল না, সুতরাং গালিব তাঁর কাছে ছিলেন আর-পাঁচজনের মতই একজন। তা ছাড়া ইনি ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্য-পরায়ণ, নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যে-কোন উপায়ে পালন করাই ছিল এঁর স্বভাব। শহর থেকে জুয়া খেলা একেবারে তুলে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে একদিন তিনি সদলে গালিবের

বাড়ীতে হানা দিয়েছিলেন। কতকগুলি পাল্কীর মধ্যে সেপাইদের বসিয়ে চারিধারে পর্দা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। পাল্কীগুলি গালিবের বাড়ীর সামনে এসে থেমেছিল যেন কতকগুলি পর্দানশীন রমণী গালিবের বাড়ীর মেয়েদের কাছে বেড়াতে এসেছে। গালিব ও বন্ধুরা তখন জুয়াখেলায় মত্ত। পুলিশের সেপাইরা এইভাবে গালিবের বাড়ীতে ঢুকে তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে —সকলকে গ্রেপ্তার করেছিল। জুয়াড়ীরা অবশ্যই গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, তবে কোন ফল হয় নি। জুয়াড়ীদের মধ্যে যারা ছিল ধনী ব্যবসায়ী তারা ঘুষ অথবা ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গালিব ছাড়া পান নি, কারণ তাঁরই বাড়ী ছিল জুয়ার আড্ডা। আড্ডা-ধারী হিসাবে তাঁর গ্রেপ্তার বহাল থেকেছিল। যথাকালে ম্যাজি-স্ট্রেটের এজলাসে তাঁর বিচার হয়েছিল, আইন ভঙ্গ করে বাড়ীতে জুয়ার আড্ডা চালানোর অভিযোগে। তাঁর বন্ধুরা, এমন-কি স্বয়ং বাদশা তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি ছ' মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও নগদ দুশো টাকা জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়। দণ্ডাদেশটি এইরকম ছিল যে বাড়তি 50 টাকা জরিমানা দিলে সশ্রম কারাদণ্ডের বদলে ছ'মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ হবে, আর দুশো টাকা জরিমানা না দিলে ছ'মাসের বদলে একবছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। গালিবকে অবশ্য ছ'মাস কারাদণ্ড শেষ পর্যন্ত ভোগ করতে হয় নি, তিনমাস কাল দণ্ডভোগের পর দিল্লীর

সিভিল সার্জন ডঃ রসের সুপারিশে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এই কারাদণ্ড গালিবের ব্যক্তিগত অভিমানে দারুণভাবে আঘাত হেনেছিল। জরিমানার টাকা দেওয়া হয়েছিল এইজন্য তাঁকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় নি— এটা ছিল বিনা-শ্রমের কারাবাস। গালিবের সামাজিক ও সাহিত্যিক মর্যাদা সম্বন্ধে অবশ্য কারা-কর্তৃপক্ষ অবহিত ছিলেন, এইজন্য তাঁর প্রতি বেশ সদয় ব্যবহার দেখানো হয়েছিল। তাঁর প্রয়োজনীয় সব-কিছুই বাড়ী থেকে প্রেরিত হত, বন্ধুবান্ধবেরা ইচ্ছামত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন— এ-বিষয়ে কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। এই কারাবাসের কারণ ছিল একটি নৈতিক অপরাধ, জনসাধারণের চোখে তাঁর মর্যাদাহানির পক্ষে এটা ছিল যথেষ্ট, সুতরাং এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি গালিবের পক্ষে যৎপরোনাস্তি মনঃকষ্টের কারণ হয়েছিল। বৃহত্তর সমাজ এই ধরনের ব্যাপার ক্ষমার চোখে দেখে না। কী অপরাধে কারাদণ্ড হয়েছিল সেটা ভাল ভেবে বিচার না করেই সমাজ সাজা-পাওয়া অপরাধীকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে থাকে— এটাই হল রীতি। এর ফলে বহুদিন ধরে গালিবকে সমাজের এই ঘৃণা বা নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। এটা গালিবের পক্ষে একসময় এত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল যে তিনি দিল্লী ছেড়ে অন্য কোন স্থানে বাস করার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন নতুন জায়গায় গিয়ে তাঁর অতীত এই অধ্যায়ের জন্য তাঁকে লোকের ঘৃণা বা বিদ্রূপ সহ্য করতে হবে না।

এই ঘটনায় গালিবের সম্মান-হানি হলেও এতে সাহিত্যের দিক থেকে অবশ্য বেশ কিছু লাভ হয়েছিল। কারাবাস কালে গালিব ফার্সীতে দীর্ঘ একটি কবিতা রচনা করেছিলেন, এতে তাঁর মানসিক চিন্তা ও অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছিল। এই কবিতার মধ্যে এই দুর্ঘটনায় তাঁর অন্তরের ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। যে অশুভ নিয়তি ও যে হৃদয়হীন সমাজ তাঁর মহত্ত্বের কথা গ্রাহ্য না করে শহরের চোর-বদমায়েশদের সঙ্গে একত্রবাসের যন্ত্রণার মধ্যে তাঁকে নিক্ষেপ করেছে তাদের প্রতি তিনি এই কবিতায় অভিশাপ দিয়েছিলেন। তাঁর এই বিপদের দিনে যে-সব বন্ধুরা তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের তিনি এই কবিতায় বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। এই বন্ধুদের মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট ছিলেন নবাব মুস্তাফা খান শাইক্তা। এই উচ্চবংশসম্ভূত ব্যক্তি গালিবের একজন অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ছিলেন। শাইক্তা ছিলেন উর্দু ও ফার্সী ভাষার একজন কবি। ফার্সী কাব্য চর্চায় ইনি গালিবের পরামর্শ নিতেন। শাইক্তা ফার্সী ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য গালিবকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। গালিবের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বত্তারও ইনি পরম অনুরাগী ছিলেন। গালিবের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া মাত্র ইনি গালিবকে মুক্ত করার জন্য নিজের প্রভাব প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে সফল হন নি। গালিবকে শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা হয়েছিল। শাইক্তা মামলা লড়বার জন্য গালিবকে অর্থ সাহায্যও করেন। গালিব যতদিন জেলে ছিলেন, একদিন

পর পর নিয়মিত ভাবে তিনি জেলে গিয়ে গালিবের সঙ্গে শুধু দেখাই করে আসতেন না, গালিবের কারাবাসের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব ততক্ষণ জেলে গালিবকে সঙ্গদান করতেন। উল্লিখিত কবিতায় গালিব তাঁর প্রতি এই বন্ধুর অবিচল প্রীতি ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশের জন্য গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

দরবারী ইতিহাসকার

কারামুক্তির পর গালিব কিছুকাল মৌলানা নাসিরুদ্দীন ওরফে মিঞা কালে সাহেবের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে বাস করেন। ইনি ছিলেন বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক গুরু। গালিবের আর্থিক দুরবস্থার কথা তাঁর কোন বন্ধুরই অবিদিত ছিল না। এই সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য গালিবের কিছু নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা খুবই জরুরী হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের মন্ত্রী ও চিকিৎসক আহ্‌শানুল্লা খাঁ খুবই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, ইনি গালিবেরও ছিলেন একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। ইনি এবং মৌলানা নাসিরুদ্দীন দুজনে মিলে স্থির করেন যে বাদশার নিকট এঁরা গালিবের কথা জানিয়ে তাঁর জন্য একটা ব্যবস্থা করবেন। এঁদের সুপারিশে 1850 খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথমে বাদশা গালিবকে তৈমুর রাজবংশের ইতিহাস ফার্সী ভাষায় রচনার ভার দিয়ে তাঁর জন্য বার্ষিক ছয়শো টাকা পারিশ্রমিক মঞ্জুর করেন। এ ছাড়াও তাঁকে সম্মানসূচক

দরবারী পোষাক ও নজ্মুদ্দৌল্লা, দবীর-উল্-মুলুক নিজাম জঙ্গ্ খেতাবও দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে গালিব স্থায়ী বেতনে মুঘল দরবারের একজন কর্মচারী হয়ে পড়লেন, তাঁর একটা নির্দিষ্ট দায়িত্বও থাকল। এইসঙ্গে আহ্শানুল্লা খাঁকে এমন ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করে গালিবকে দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেগুলির উপর ভিত্তি করে গালিব ফার্সীতে তাঁর ইতিহাস রচনা করতে পারেন। ইতিহাস রচনার এই কাজটি 1857 খ্রীস্টাব্দে 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটার সময় পর্যন্ত চলেছিল। গালিবের ইচ্ছা ছিল যে এই ইতিহাস তিনি দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ করবেন। এর প্রথম খণ্ডে থাকবে তৈমুর থেকে হুমায়ূঁ পর্যন্ত, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে আকবর থেকে দ্বিতীয় বাহাদুর শার রাজত্বকালের বিবরণ। আহ্শানুল্লা খাঁর উপর এই দায়িত্ব ছিল যে ইনি বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করে সেগুলি ফার্সীতে অনুবাদের জন্য গালিবকে জুগিয়ে যাবেন। কিন্তু ইনি এই কাজ নিয়মিত ভাবে করে যেতে পারেন নি কারণ এঁর হাতে আরো অনেক কাজ ছিল। এর ফলে প্রস্তাবিত ইতিহাসের প্রথমখণ্ডের কাজ বেশ কয়েক বছর ধীরে ধীরে চলার পর কোনরকমে সম্পন্ন হয়েছিল। মনে হয়, দ্বিতীয় খণ্ড রচনার উপাদান আদৌ গালিবের হাতে এসে পৌঁছায়নি। এই কাজের অগ্রগতিতে কারো কোন ঔৎসুক্য নেই দেখে, গালিবও নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আর উপকরণ সংগ্রহের জন্য আহ্শানুল্লা

খাঁকে তাগাদা দিতেন না। এর ফলে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খণ্ডটি লেখা হয়ে ওঠে নি। এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডটি লালকেল্লার শাহী ছাপাখানা থেকে 1854 খ্রীস্টাব্দে 'মিহরেনীম রুজ্' নামে প্রকাশিত হয়।

এর পর গালিবের জীবনের কিছু কাল মোটামুটি সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল। বাদশাহের সাহিত্য-সংক্রান্ত ব্যাপারের পরামর্শদাতা মুহম্মদ ইব্রাহিম জৌক 1854 খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। বাদশাহ্ এর পর থেকে গালিবকেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। বাদশাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মির্জা ফখরুদ্দীনও সাহিত্য-ব্যাপারে গালিবের শরণাপন্ন হতেন। মির্জা ফখরুদ্দীন এই সেবার জন্য গালিবকে বার্ষিক 500 টাকা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থাও করেন। এ ছাড়াও অব্ধের শেষ শাসক ওয়াজিদআলি শা কিছু বার্ষিক বৃত্তি দিয়ে গালিবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। স্পষ্টই বোঝা যায় একই সঙ্গে এতগুলি বার্ষিক ভাতার দৌলতে এই সময় গালিব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অপেক্ষাকৃত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই দিন কাটাতে পেরেছিলেন।

বিপ্লব

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই স্বাচ্ছন্দ্যের দিনগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। 1857 খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ভারতীয় ইতিহাসের সেই ঘটনাটি ঘটেছিল, ব্রিটিশের ভাষায় যাকে বলা হয় 'সিপাহী বিদ্রোহ'।

ভারতের মানুষ এই ঘটনাটি 'প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' নামে অভিহিত করে থাকেন। এই ঘটনায় ভারতের রঙ্গমঞ্চ থেকে তৈমুর রাজবংশের নাম অপসৃত হয়ে যায় এবং ভারত-ভূমি বিদেশী শক্তির পদানত হয়। গালিব এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সংকট এড়াতে পারে নি। এই বিপ্লবের মূল কারণ হ'ল ইংরাজের রাজনৈতিক দমন-নীতি ও অত্যাচার। এই কাণ্ড চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে যখন থেকে মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য বৃত্তি ছেড়ে ইংরেজেরা দেশ-শাসন শুরু করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের লোকের সঙ্গে ইংরাজেরা বণিক্-রূপে এদেশে এসেছিল। এই উদ্দেশ্যে একটি রাজকীয় সনদের বলে ইংলণ্ডে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল। প্রথমে দিল্লী ও পরে আগ্রায় যতদিন কেন্দ্রীয় মুঘল শাসন শক্তিশালী ও সক্রিয় ছিল ততদিন পর্যন্ত এই কোম্পানি অধ্যবসায়ের সঙ্গে বাণিজ্য বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। 1707 খ্রীস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরই দিল্লীর সরকারের প্রভাব দেশের দূরপ্রান্তস্থিত স্থানগুলির উপর শিথিল হয়ে পড়ায় সমগ্র দেশে অস্থিরতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। এই অস্থির রাজ-নৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দুটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনার সন্ধান পেয়ে এই দেশে নিজেদের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিল। এই উদ্দেশ্যে এদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এরা সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ শুরু করে। এরা নিজেদের কুঠী-শহরগুলি সুরক্ষিত

ক'রে নিয়ে, বেতনভুক সৈন্যবাহিনী রাখতে আরম্ভ করেছিল। উচ্চাভিলাষী স্থানীয় শাসকদের ক্ষমতার লড়াইয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দুটি বণিক্ সংস্থা নিজেদের পছন্দমত শাসকদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে নামত। নিজেদের মনোনীত ব্যক্তির জয়লাভ হলে— এ'দের একপক্ষের নিজেদেরও শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি হত। শেষ পর্যন্ত বোঝা গিয়েছিল যে এই লড়াইয়ের শেষ পরিণাম হবে ইংল্যাণ্ড অন্যথা ফ্রান্সের এদেশে প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি।

দেশে বহুদিন ধরে শান্তি ও সমৃদ্ধির স্রোত প্রবাহিত থাকায় দেশের শাসন ও সামাজিক ব্যবস্থার বেশ অবনতি ঘটেছিল। অঙ্গরাজ্যগুলি তাসের প্রাসাদের মত ভেঙে পড়ছে, তার জায়গায় রাতারাতি নূতন নূতন রাজ্য গজিয়ে উঠছে— এই অবস্থাটা স্বভাবতই যে-কোন ভাগ্যান্বেষীর পক্ষে অনুকূল। অনেক বছর ধরে ব্রিটিশ ও ফ্রান্স এ'দেশে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছিল। এই দ্বন্দ্বে ব্রিটিশের ভাগ্যেই জয়লাভ ঘটেছিল, ভারতের বিস্তৃত ভূখণ্ডে এদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফরাসীরা ধীরে ধীরে তাদের অধিকার হারিয়ে শেষ পর্যন্ত হঠে যেতে বাধ্য হয়, এদের শত্রু ব্রিটিশই শেষ পর্যন্ত টিকে যায়। নিজের শক্তিতেই হোক অথবা বশম্বদদের সাহায্যেই হোক ব্রিটিশ শক্তি ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এখন তারা অধ্যবসায় সহকারে সমগ্র দেশ তাদের কুক্ষিগত করার চেষ্টা চালিয়ে ছিল। এর ফলে যে-সব ভারতীয় শাসক বা রাজাকে তারা অধিকারচ্যুত করেছিল তাঁরা হয়ে

উঠেছিলেন খুবই বিক্ষুব্ধ। এঁরা এই নূতন প্রভুদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। একটা সুসম্বদ্ধ প্রতিরোধের সুযোগ না থাকায় এই বিদ্বেষের আগুন শুধু ধিকি ধিকি ভাবে জ্বলতে থাকত, বাইরে থেকে এটা প্রকাশ পেত না। একটা উপযুক্ত ক্ষণে শুধু ছিল বিস্ফোরণের অপেক্ষা। এই উপযুক্ত ক্ষণটি কিন্তু এসে পড়েছিল। উপলক্ষ্যটা ছিল এই : দৈবক্রমে ব্রিটিশের সামরিক কর্তৃপক্ষ সৈন্যবাহিনীর ব্যবহারের জন্য একটি নূতন ধরনের বন্দুকের কার্টিজ বা 'গুলি' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গুলি ছোঁড়ার আগে এই কার্টিজের নিম্নাংশ দাঁত দিয়ে কেটে নিতে হত। এমনি একটা গুজব রটে গেল যে হিন্দু ও মুসলমান সৈনিকদের ধর্ম নষ্ট করার জন্যই এটি প্রবর্তন করা হচ্ছে, এই কার্টিজ গোরু ও শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি।

ব্রিটিশের ভারত-আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নীতি ছিল হিন্দু ও মুসলমান ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীস্ট-ধর্ম প্রচার। ব্রিটিশের এই চেষ্টার পরিচয় ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদের মেয়াদ 1833 খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের গভর্নমেণ্ট যখন বাড়িয়ে দেন তার একটি যুক্তি এই ছিল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা ভারতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের সহায়তা হবে। ভারতের ব্রিটিশ সরকার দেশের নানাস্থানে যে-সব স্কুল-কলেজ স্থাপন করেন খ্রীস্টধর্মের বিষয়গুলি যেখানে আবশ্যিক পাঠ্য ছিল। দিল্লী শহরেই পুরাতন দিল্লী কলেজের কতকগুলি ছাত্র প্রকাশ্যেই খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, এঁদের মধ্যে রামচন্দ্র ও

ডাঃ চমনলালের নাম উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণ আগে থেকেই ইংরাজ মিশনরীদের উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম সন্দেহের চোখে দেখত। এই ঘটনার পর দেশীয়দের মধ্যে কারো মনে এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ ছিল না যে পাশ্চাত্যদেশীয় শাসকদের আসল উদ্দেশ্য হ'ল তাদের তরুণ সমাজকে বিপথগামী করে তাদের স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করা। এই সন্দেহ বাতিকের বাতাবরণে কার্টিজ সংক্রান্ত রটনাটি যেন একটি উত্তেজক ভেষজের রূপ নিয়ে এটিকে বাড়িয়ে তুলেছিল। স্বভাবতই রটনাটি সত্য বলেই গৃহীত হয়েছিল। এই রটনা সৈন্যবাহিনীর মনে দাবানলের মত রোষ ও অসন্তোষ ছড়িয়ে দিয়েছিল। প্রথম বিস্ফোরণ ঘটেছিল সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজের সময় 1857 খ্রীস্টাব্দের 10ই মে মীরাটে। এই সময় স্থানীয় পদাতিক বাহিনী ব্রিটিশ সেনানায়কের আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই বাহিনী 'অফিসর'দের হত্যাও করেছিল। কিছু সৈন্য এর আগে অবাধ্যতার জন্য যে কারাগারে আবদ্ধ ছিল, তার দরজা ভেঙে তাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই দিনই সন্ধ্যাকালে কিছু-সংখ্যক সৈন্য দিল্লীর দিকে রওনা হয়ে যায়। পরদিন 11ই মে প্রাতঃকালে এরা দিল্লী পৌঁচেছিল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নায়কত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করে নিজেকে ভারত সম্রাট রূপে ঘোষণা করার জন্য এই সিপাহীরা বাহাদুর শাহকে অনুরোধ জানিয়েছিল। বাহাদুর শাহের বয়স তখন 82 বৎসর। ইনি সিপাহীদের এই অনুরোধ রক্ষা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিস্থিতি

এমন একটা অবস্থায় পৌঁচেছিল যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত এই অনুরোধ রক্ষা করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে এই বিদ্রোহ অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহের যাঁরা নায়ক ছিলেন তাঁরা ক্রমে ক্রমে এসে দিল্লীতে সমবেত হয়ে একটা অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন— এর শীর্ষে নামে মাত্র রাখা হল বাহাদুর শাহ্‌কে। দিল্লীস্থিত সব ব্রিটিশ সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি হয় নিহত হয়েছিল নতুবা তাদের প্রাণভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যেখানে সেখানে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। পাঁচ মাসের অধিককাল দিল্লী শহরটি ভারতীয় ফৌজের অধিকারভুক্ত ছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই বিপদে দিশেহারা হয়ে পড়ে নি। ভাগ্যের প্রসাদে এবং দৃঢ়তার সাহায্যে ব্রিটিশ নানাস্থানে এই বিদ্রোহ দমন করে ফেলেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা দিল্লীর যুদ্ধেও জয়লাভ করেছিল। 1857 খ্রীস্টাব্দের 19শে সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ দিল্লী পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল।

এই ঘটনার পর দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল প্রতিশোধমূলক দমন-নীতির পালা। হাজার হাজার নাগরিককে নামমাত্র বিচারের পর ফাঁসি দেওয়া হয়। এদের বিষয়-সম্পত্তি ধন-দৌলতও বাজেয়াপ্ত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফাঁসির বিনিময়ে অভিযুক্তদের কাছ থেকে অসম্ভব রকম ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছিল। বহু সংখ্যক ব্যক্তি শহর ছেড়ে পালিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এই-সব অপরিচিত স্থানে

পলাতকেরা দীর্ঘকাল ধরে কঠোর দারিদ্র্য ও কষ্টের সঙ্গে আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। অবস্থার উন্নতি হওয়ার পর এরা নিজের নিজের বাড়ীতে ফিরতে পেরেছিল।

এই বিপ্লবের কালে গালিব দিল্লীতেই ছিলেন, শহর ছেড়ে তিনি কোথাও যান নি। আসল কথা এই ছিল যে তাঁর যাবার মত অন্যত্র কোথাও আশ্রয়ও ছিল না। এই সময়টি তাঁর খুব কষ্টেই কেটেছিল। অনেকদিন ধরে তাঁর আয়ের সূত্র দাঁড়িয়েছিল মাত্র দুটি। একটি ছিল ব্রিটিশের খাজানা থেকে বার্ষিক 750 টাকা, দ্বিতীয়টি ছিল মুঘল রাজবংশের ইতিহাস-লেখকরূপে বাহাদুর শাহের কাছ থেকে বাষিক পাওনা 600 টাকা। বিদ্রোহীরা দিল্লীতে পোঁছানো মাত্র শহরে ব্রিটিশ শক্তি বা শাসন ভেঙে পড়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের কোন ঘাঁটি নেই কাজেই গালিবেরও পেনসন প্রাপ্তি সম্ভব হয় নি। বাহাদুর শার নিজস্ব ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন দামই এসময়ে ছিল না, তিনি হয়ে পড়েছিলেন সম্পূর্ণভাবে অন্যদের হাতের খেলার পুতুল, তা ছাড়া তাঁরও ছিল অর্থাভাব, গালিব বা অন্য কারো পাওনা মেটানোর সামর্থ্য তাঁর এখন ছিল না। দুটি মাত্র আয়ের পথ, তাও যখন বন্ধ তখন স্বাভাবিক কারণেই খুব কষ্টের মধ্যেই গালিবকে এই সময়ে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল।

এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করে নি কারণ এর পেছনে পর্যাপ্ত আয়োজন বা পরিকল্পনা ছিল না। এই বিদ্রোহের যাঁরা নায়ক ছিলেন তাঁদের সামনে কোন নিশ্চিত বা সুচিন্তিত

কার্যক্রম ছিল না। এক-একটি শহরে ছিল এক-একটি স্থানীয় নেতা, এদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বা সহযোগিতা ছিল না। অপর দিকে, ব্রিটিশের ছিল একটি সুগঠিত ও সুসম্বদ্ধ সেনাবাহিনী এবং একটি নির্দিষ্ট মূল উদ্দেশ্য। এমন-কি, ভারতের জনসাধারণও ইংরাজ শক্তির উচ্ছেদের ব্যাপারে একতা-বদ্ধ হতে পারে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ পরিপূর্ণভাবে ছিল এই সংগ্রামে ব্রিটিশের সমর্থক। দিল্লীতে ও পরে লক্ষ্ণৌয়ে যে ব্রিটিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের পর্যুদস্ত করেছিল তার সৈন্যেরা ছিল বিভিন্ন শিখ-রাজ্যের প্রজা, অর্থাৎ শিখ সৈন্যদের সাহায্যে সিপাহী বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল। নেপালের রাজাও ব্রিটিশের সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। ভারতীয় বিদ্রোহী সৈন্যেরা অধিকাংশই ছিল যুদ্ধবিদ্যায় অপটু তাদের মধ্যে সঙ্ঘ-বদ্ধতারও অভাব ছিল। কাজেই বিদ্রোহীদের এক-একটা শক্ত ঘাঁটি ব্রিটিশের প্রতি-আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে পারে নি। ফলে বিদ্রোহের বছরটি শেষ হওয়ার পর দেখা গেল যে বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া দূরের কথা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

দিল্লী ব্রিটিশের অধিকারে ফিরে আসার পর দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছিল। গালিব ভেবেছিলেন যে তাঁরও পূর্বের অবস্থা ফিরে আসবে এবং তাঁর পারিবারিক পেনসনের টাকা

আগের মতই ব্রিটিশের কোষাগার থেকে পাওয়া যাবে। কিন্তু হায়, গালিবের এই আশায় ছাই পড়েছিল।

গালিব বেশ দূরদর্শী ছিলেন, তাঁর সাংসারিক বুদ্ধিও প্রখর ছিল। দিল্লীতে গোলমাল যখন সুরু হল, তখন কেউ-ই বুঝতে পারে নি হাওয়া বইবে কোন্ দিকে। গালিব ব্রিটিশ-বিরোধী কাজকর্ম থেকে নিজেকে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত রেখেছিলেন। লাল-কেল্লা বা বাহাদুর শাহের দরবার ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী কাজ-কর্মের কেন্দ্র। গালিবের পক্ষে এই দরবারের সংস্রব সম্পূর্ণ রূপে এড়িয়ে চলা অবশ্য সম্ভব হয় নি। 1854 খ্রীস্টাব্দে বাদশাহের সাহিত্য-বিষয়ক পরামর্শদাতা মোহাম্মদ ইব্রাহিম জৌকের মৃত্যু হয়েছিল। এর পর গালিব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি আগে থেকেই দিল্লী দরবারের সরকারী ইতিহাস-লেখক ছিলেন, তার উপর তিনি এখন বাদশাহের সাহিত্য-বিষয়ক পরামর্শদাতা হওয়ায় প্রায় নিয়মিতভাবেই তাঁকে বাদশাহের কাছে যাওয়া-আসা করতে হত। এই সময়ে দিল্লীতে এমন কোন ইংরাজ রাজকর্মচারী ছিলেন না যাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে ইংরাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারত। এই অবস্থায় গালিব ভেবেছিলেন শাহী দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেও প্রকাশ্যে কোন পক্ষে যোগ না দেওয়াটাই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ। এই সতর্কতা সত্ত্বেও ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয় নি। তাঁর বিপদ ঘটেছিল।

‘সিক্কা’ অভিযোগ

ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হওয়ার পরও ইংরাজেরা দিল্লী শহরে ও লাল কেল্লার ভেতরে কী ঘটছে তা জানার জন্য একটি বেশ সক্রিয় গুপ্তচর-চক্রের ব্যবস্থা রেখেছিল। এই গুপ্তচর-চক্র বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য সব রকম সংবাদ সংগ্রহ করে তা ব্রিটিশ বাহিনীর সেনাধ্যক্ষকে পাঠিয়ে দিত। এই সেনাধ্যক্ষের আস্তানা ছিল কাশ্মীরী জোটের বাইরে উচ্চ ভূমির উপর। একদিন এক গুপ্তচর মারফৎ এখানে সংবাদ এল যে বাহাদুর শাহ্-আমন্ত্রিত একটি দরবারে গালিবও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি একটি ‘সিক্কা’ রচনা করে বাদশাহ্‌কে উপহার দেন। বাহাদুর শাহ্ যে নূতন মুদ্রা প্রবর্তন করতে চলেছেন তার উপর উৎকীর্ণ হওয়ার জন্যই এই সিক্কাটি রচিত হয়েছে। আসলে ঘটনাটি ছিল বিকৃত। যে ‘সিক্কা’টি গালিব-রচিত বলে রটনা হয়েছিল সেটি গালিব লেখেন নি। ঐটি একজন অল্প-খ্যাত কবির রচনা, উল্লিখিত শাহী দরবারে বাদশাহের সামনে পঠিত হওয়ার আগেই একটি কাগজে এটি প্রকাশিত হয়। বিকৃত বা অসত্য হলেও এই খবরটি ইংরাজের দপ্তরে নথিভুক্ত থেকে গিয়েছিল। দিল্লী ইংরাজ-কর্তৃক পুনরধিকৃত হওয়ার পর গালিব যখন দিল্লীর ইংরাজ চীফ্ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন তাঁকে এই অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিদ্রোহ চলা কালে গালিব ব্রিটিশ-বিরোধী কোন কাজে সক্রিয়

ভাবে জড়িত ছিলেন না, এইজন্য দিল্লী পুনরধিকৃত হওয়ার পর গালিবের জীবন বা সম্পত্তির নিরাপত্তা বজায় ছিল। 'সিক্কা'র ব্যাপারটাকেও ইংরাজেরা একটা কবি-সুলভ দুর্বলতা বলেই গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্রোহ দমনের কালে শুধু মাত্র সন্দেহ বলে বহু লোককেই ইংরাজেরা হত্যা বা কারারুদ্ধ করেছিল। এক্ষেত্রে গালিবের প্রতি ইংরাজেরা যে বিশেষ দয়া দেখিয়েছিলেন এটা খুবই সত্য। গালিবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এসেছিল তার একমাত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া এই হয়েছিল যে অতঃপর তাঁর ইংরাজদের কাছ থেকে প্রাপ্য পারিবারিক 'পেনসন' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর-একটা ক্ষতি এই ছিল যে অতঃপর গভর্নর জেনারেল বা লেঃ গভর্নরের দরবারে তাঁর নিমন্ত্রণও বন্ধ হয়ে যায়। গালিব ভেবেছিলেন যে ইংরাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পূর্বের অবস্থা সর্বতোভাবেই ফিরে আসবে। পেনসন ও দরবারে নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল তাঁর প্রত্যাশার অতীত, তাই এই ঘটনায় তিনি খুবই হতাশাপন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর পূর্বাবস্থা ফিরে আসা দূরের কথা, বর্তমান অবস্থারও বেশ অবনতি ঘটেছিল। কিছু সংখ্যক বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি এই সময় তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে না এলে তাঁর পক্ষে এই অবস্থাটা আরও দুঃসহ হয়ে উঠত। সৌভাগ্যক্রমে, রামপুরের নবাব ইউসুফ আলি খান তাঁকে এই দুরবস্থার কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

রামপুরের সঙ্গে সম্পর্ক

1855 খ্রীস্টাব্দে রামপুরের নবাব মোহাম্মদ সঈদখানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইউসুফ আলি খান রামপুর নবাবে 'গদি' পান। এই তরুণ যুবক সাহিত্য বিষয়ে বেশ পারদর্শী ছিলেন। অল্পবয়সে এঁর পিতা এঁকে শিক্ষালাভের জন্য দিল্লী পাঠিয়ে দেন। ছাত্রাবস্থায় যাঁদের কাছে ইনি ফার্সী শেখেন তাঁদের মধ্যে গালিব অন্যতম। নবাবপুত্রের রামপুরে ফেরার পর অবশ্য এই যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। 1855 খ্রীস্টাব্দে ইনি যখন নবাব হন তখন গালিব এই ছিন্ন সংযোগ পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে একটি কবিতা লিখে পাঠান। গালিবের এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি, কারণ নবাব এতে কোন সাড়া দেন নি। গালিব এর পর এ-বিষয়ে নিজে থেকে আর কোন চেষ্টা করেন নি। 1857 খ্রীস্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটার আগে থেকেই গালিবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু রামপুরে থাকতেন। এঁর নাম ছিল মৌলবী ফজল হক। তরুণ নবাবের উপর তাঁর গভীর প্রভাব ছিল। ফজল হকের পরামর্শে গালিব একটি 'কসীদা' রচনা করে নবাবকে পাঠিয়ে দেন। ফজল হক আশা করেছিলেন যে এর দ্বারা গালিব ও তরুণ নবাবের মধ্যে ছিন্ন সংযোগ পুনঃ-স্থাপিত হবে, আর এর ফলে গালিবের পক্ষে নবাবের কাছ থেকে একটা স্থায়ী পেনসন অন্ততঃপক্ষে এককালীন মোটা রকমের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে।

সৌভাগ্যক্রমে গালিবের এবার কপাল খুলেছিল। নবাব ইউসুফ আলী কসীদাটি পেয়ে শুধু খুশিই হন নি, উনি স্থির করলেন যে তিনি কাব্য রচনার ব্যাপারে গালিবের 'সাগ্‌রেদ' বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। গালিব ও নবাবের মধ্যে এই নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠার কয়েক মাস পরই দেশের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। এই দুর্যোগের মধ্যেও গালিব ও নবাবের মধ্যে নিয়মিত পত্রব্যবহার চলেছিল। এর আগে নবাবের কাছ থেকে মাঝে মাঝে গালিব কিছু কিছু আথিক সাহায্যও পেয়েছিলেন তবে বেতন হিসাবে নিয়মিত কোন টাকা তিনি পান নি, এটা নির্ধারিত হয় নি। দিল্লীতে ইংরাজের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গালিব যখন দেখলেন ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর পূর্বের সম্পর্ক আর ফিরল না— পারিবারিক পেনসনও বন্ধ হয়ে গেল তখন তিনি নবাবকে অনুরোধ করলেন তাঁর জন্য একটি স্থায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করতে। নিত্য আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে তাঁর এই বৃত্তি তাঁকে মুক্তি দিতে পারে এ কথাও নবাবকে জানানো হয়েছিল। নবাব তাঁর এই আবেদন পেয়ে আদেশ দিয়েছিলেন যে অতঃপর তাঁকে রামপুর কোষাগার থেকে মাসিক এক শত টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে।

দস্তম্বু

সিপাহী-বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গময় দিনগুলি গালিবকে ঘরের মধ্যে বসে কাটাতে হয়েছিল। কর্মহীন এই দিনগুলি কাটানোর

জন্যই সম্ভবতঃ গালিব তাঁর চার পাশে দিল্লী শহরে যে-সব ঘটনা ঘটে চলেছে সেগুলি টিপ্পনী বা নোটের আকারে লিখে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। এগুলো যে ঠিক নিয়মিত দিনলিপির আকারে লিখিত হয়েছিল তা নয়, সংঘটিত বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি এমনভাবে এতে লিপিবদ্ধ করে রাখা হত যেন ভবিষ্যতে এগুলি এই বিশেষ যুগের বিস্তৃত বিবরণ লেখার কাজে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যায়। ব্রিটিশশক্তি কর্তৃক দিল্লী বিজয়ের পর গালিব এই টিপ্পনীগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে ফার্সী ভাষায় 'দস্তম্বু' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। গালিবের দাবি ছিল এই যে ব্যক্তি ও স্থান-নামের ক্ষেত্রে ছাড়া এই পুস্তকে তিনি কোন আরবী ভাষার শব্দ ব্যবহার করেন নি। তবে গালিবের এই দাবি সর্বাংশে যথার্থ ছিল না। গালিবের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও এই রচনায় কিছু আরবী শব্দের অনুপ্রবেশ রুদ্ধ করা যায় নি। গালিব আরবী শব্দের ব্যবহার রোধ করতে গিয়ে বহু প্রচলিত ও পরিচিত আরবী শব্দের পরিবর্তে ফার্সী ভাষার এমন-কিছু শব্দ ব্যবহার করেন যা তৎকালে অপ্রচলিত ছিল। এই কারণে 'দস্তম্বু' পুস্তকটি মোটেই সুখপাঠ্য হয় নি, এতে দুর্বোধ্যতাও থেকে গিয়েছিল।

সমসাময়িক কালের ইতিবৃত্তমূলক পুস্তক হিসাবেও এটি নির্ভরযোগ্য হয় নি। আমরা এর আগে দেখেছি যে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে গালিব বাহাদুর শাহের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলেন, কতকটা বাধ্য হয়ে তাঁকে এই সময়ে এমন সব

লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়েছে, যারা ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী।

ব্রিটিশ-বিরোধী এমন কোন কাজে তিনি লিপ্ত হন নি, যাতে তাঁকে ব্রিটিশ-বিরোধী বলে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গালিবের মনে শঙ্কা থেকে গিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী কাজে লিপ্ত না থাকলেও ব্রিটিশেরা তাঁকে সুনজরে দেখবে না। অপর পক্ষে, বাদশাহের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যের ব্যাপারটিকে সহজেই ব্রিটিশ-বিরোধিতা বলে ধরে নেওয়া হবে। কাজেই, 'দস্তম্বু' সংকলন কালে তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন যেন ভারতীয় সিপাহীদের দোষ-ত্রুটিগুলি কোন-মতেই ছোট করে না দেখা হয় আর ব্রিটিশের অত্যাচার-নিপীড়নের ঘটনাগুলি যেন প্রাধান্য না পায়। আগে থেকেই তিনি ভেবে রেখেছিলেন যে এই বই ছাপিয়ে এটি তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী ইংরাজ রাজকর্মচারীদের উপহার দেবেন। এদের অভিরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে গালিব কিছু ঘটনার উল্লেখ এড়িয়ে যান, আবার কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকেও পূর্ণমাত্রায় রঙ চড়িয়ে উল্লেখ করেন। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি যে রচনার লক্ষ্য, তা কখনও ইতিহাস নামের যোগ্য নয়, তা থেকেও ইতিহাসের উপাদান কোনমতেই আহরণযোগ্য নয়।

গালিব চেয়েছিলেন এই বইটি ব্রিটিশের কাছে তাঁকে নূতন-ভাবে গ্রহণ-যোগ্য করে তুলবে। তিনি এই বইয়ের মাধ্যমে ইংরাজদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ইংরাজের দুঃসময়েও তিনি

তাঁদের বন্ধুর কাজ করেছিলেন। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর গালিব এর কপি ভারতে অবস্থিত বহু বিশিষ্ট ইংরাজ রাজ-কর্মচারীদের উপহার স্বরূপ পাঠান। ইংলণ্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছেও এই বই উপহার স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিল। তবুও এই বই কোন ইংরাজের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। গালিব যে উদ্দেশ্যে বইটি রচনা করেন ও ইংরাজদের উপহার দেন তা ব্যর্থ হয়েছিল। এই বইয়ে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল এর ভাষা, এটি বেশ সুবোধ্য মোটেই ছিল না। ইংরাজদের সঙ্গে একটা হৃদ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য গালিবের এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সুতরাং সাফল্য লাভ করতে পারে নি। ইতিমধ্যে, গালিবের বহু বন্ধু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে ইংরেজ কতৃপক্ষ তাঁকে ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারেন। এঁদের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা খুবই অল্প ছিল। গালিব যে ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন নি এটা ইংরাজকে দিয়ে স্বীকার করানো খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এটা শুধু সম্ভব হয়েছিল রামপুরের নবাবের হস্তক্ষেপে। শেষ পর্যন্ত 1860 খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ইংরাজ সরকার তাঁদের পূর্বতন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে গালিবের পারিবারিক পেনসন পুনরায় বহাল করেন। তিন বৎসর পর 1863 খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে, গালিবকে আবার দরবারে যোগদানের অধিকার দেওয়া হয়। এইভাবে 1857 খ্রীস্টাব্দের মে মাসের পূর্বে গালিব যে-সব সুযোগ-সুবিধা ইংরাজ-সরকারের কাছ থেকে পেতেন সেগুলি পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

কাতি'বুরহন

গালিব মূলতঃ ছিলেন কবি ও লেখক। আর্থিক দুরবস্থা ও সাংসারিক অশান্তি সত্ত্বেও দীর্ঘকাল সাহিত্যচর্চা থেকে বিরত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সিপাহী-বিদ্রোহ চলার কালে তাঁকে মাঝে মাঝে লাল কেল্লায় যেতে হলেও অধিকাংশ সময়েই তিনি একা একাই বাড়িতে বসে থাকতেন। আজীবন গালিব ছিলেন একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান পাঠক। গালিবের স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ। সিপাহী-বিদ্রোহের দিনগুলিতেও বইই ছিল তাঁর প্রধান সঙ্গী। এই বইগুলির মধ্যে একটি ছিল 'বুরহন-এ-কাতি', এটি ফার্সী ভাষায় একটি বিখ্যাত শব্দ-কোষ। অবসর সময়ে গালিব এই বইটি উল্টেপাল্টে পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। এই বিখ্যাত অভিধানটির সংকলক ছিলেন মুহম্মদ হুসেন তব্রীজী নামে এক ব্যক্তি। কলকাতা থেকে এর একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটি উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে গালিবের চোখে এর বহু দোষত্রুটি ধরা পড়েছিল। গালিব তাঁর কাছে এই অভিধানের যে 'কপি'টি ছিল তার মার্জিনে এই দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য লিখে রাখতেন। দেখতে দেখতে এই মন্তব্যগুলি সংখ্যায় বেশ স্ফীত হয়ে পড়েছিল। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর গালিব তাঁর এই মন্তব্য বা 'নোট'গুলি আলাদাভাবে নকল করিয়ে নিয়েছিলেন। বন্ধু এবং ছাত্রেরা এর থেকে উপকৃত হবে, তাদের এগুলি কাজে লাগবে গালিবের মনে এই ধারণা জন্মেছিল। প্রথম প্রথম এগুলি পুস্তকাকারে

প্রকাশ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। শেষকালে, তাঁর কোন কোন বন্ধু তাঁকে এই বইটি ছাপাবার পরামর্শ দেন। এঁদের যুক্তি ছিল যে এই বইটি প্রকাশিত হলে সাধারণ পাঠকের বেশ কাজে লাগবে এবং ফার্সী-পণ্ডিত হিসেবে গালিবের খ্যাতিও প্রতিষ্ঠিত হবে। গালিব ভারতীয় ফার্সী-লেখকদের কঠোর সমালোচক ছিলেন, তাঁর মত ছিল এই যে ফার্সী ভাষার বিষয়ে এঁদের রচনা বা জ্ঞান মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। 'বুরহান-এ-কাতি' গ্রন্থের সংকলনকর্তা ভারতেই জন্মেছিলেন ও এদেশেই তাঁর শিক্ষা-লাভ হয়েছিল, তবে এঁর পূর্বপুরুষেরা ইরাণ-বাসী ছিলেন। ভারতীয়েরা ফার্সী ভাষায় সুদক্ষ নয়— গালিবের এই মতটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও তাঁর বইটি ছাপানো প্রয়োজন, গালিবের বন্ধুরা তাঁকে এইভাবে ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলেন। গালিবের এই বইটি 'কাতি'বুরহন'— এই নামে 1862 খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটি প্রকাশিত হওয়ায় যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়ার অবস্থা দেখা দিয়েছিল। মানুষ কোন পরিবর্তন সহজে মেনে নিতে চায় না। আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা কেবল পূর্বপুরুষদের জীবনধারাই অনুসরণ করে চলেন, কারণ তাঁরা কোন পরিবর্তন বা কোন কিছু নূতনকে ভয় পান। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা তখনই দাঁড়ায় যখন আমরা কোন একটি প্রথা বা বিষয় অন্যায় ও নিরর্থক জেনেও প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই সেটি আঁকড়ে ধরে থাকি শুদ্ধমাত্র এই কারণে যে আমাদের পুর্বপুরুষদের কাল থেকে এটা চলে আসছে। আমরা

এই কুপ্রথা বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এটা দূর করার কোন চেষ্টা করি না, জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস আমাদের থাকে না। এই যে অন্যায় বা অসত্যের সঙ্গে আপস করে চলার মনোভাব, সেটি আমাদের জীবনের নানাক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার জগতেও আমাদের এই রক্ষণশীলতা সুপ্রকট। 'বুরহন-এ-কাতি' দীর্ঘকাল ধরে ফার্সী ভাষার একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে আসছিল। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্যরূপে অনুমোদন করতেন। এমনি একটি পুস্তকের বিরূপ সমালোচনা ঔদ্ধত্য এমন-কি অধর্ম রূপে বিবেচিত হয়েছিল এবং গালিবের বিরুদ্ধে এই দুই অভিযোগই এসেছিল। বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ঝড় বইতে শুরু হয়েছিল। গালিবের মতের কড়া সমালোচনা-সূচক একের পর এক পুস্তক অথবা পুস্তিকা প্রকাশিত হতে থেকেছিল। গালিব ও তাঁর বন্ধুরা এই সব সমালোচনা নিঃশব্দে বরদাস্ত করেন নি। তাঁরা সাধ্যমত এই সব আক্রমণের সমুচিত উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গালিবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মন্দীভূত হলেও একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। ঘটনা এমনি দাঁড়িয়েছিল যে মানহানিকর রচনা প্রকাশের জন্য গালিবকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার উদ্দেশ্যে আদালতের শরণও নিতে হয়েছিল। এই অভিযোগ করা হয়েছিল আমিনুদ্দীন নামে একজন 'খিস্তি' লেখকের বিরুদ্ধে। গালিব অবশ্য এই ক্ষতি-পূরণের মামলায় জিততে পারেন নি। কয়েকজন নামকরা

পণ্ডিত ব্যক্তি ওই লেখককে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আপত্তিজনক শব্দগুলির উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা করে এটা বোঝাবার জন্য চেষ্টা করেন যে অপমানটা এত গভীর নয় যে গালিবের মানহানি হতে পারে। শেষ পর্যন্ত গালিব ক্ষতিপূরণের দাবি আদালত থেকে তুলে নিয়ে একটা আপস-মীমাংসা করে নিতে বাধ্য হন।

সভা-কবি

1860 খ্রীস্টাব্দে পেনসন পুনঃপ্রবর্তিত হওয়ার পর, 1863 খ্রীস্টাব্দে গালিব দরবারে যোগ দেওয়ার অধিকার পুনরায় লাভ করেন। এই সময় থেকে সরকারের কাছ থেকে আরও সম্মান লাভের জন্য তিনি যত্নবান হন। কর্তৃপক্ষের নিকট গালিব এই উদ্দেশ্যে একটি আবেদনও পাঠান। এই আবেদনের প্রার্থিত বিষয় ছিল যে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সভায় তাঁকে 'রাজ-কবি' নিযুক্ত করা হোক এবং তাঁর লেখা 'দস্তম্বু' সরকারী ব্যয়ে প্রকাশিত হোক। এই দুটি অনুরোধই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, তবে এটা ছিল প্রত্যাশিত। সরকারী কর্তৃপক্ষের এই প্রত্যাখ্যান ব্যাপারের পিছনে গালিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা বেশ কাজ করেছিল। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ গালিবের আবেদনের উত্তরে যে জবাব দিয়েছিলেন তা ছিল বেশ আশাপ্রদ এবং আবেদনের অনুকূলে। তাঁরা জানিয়েছিলেন যে গালিবকে রানী ভিক্টোরিয়ার দরবারের 'রাজ-কবি' নিযুক্ত করা সম্ভব নয়, তবে

গভর্নর জেনারেল যদি তাঁকে তাঁর দরবারের কবি রূপে নিযুক্ত করেন— তাতে ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না। এর পর সপারিষদ গভর্নর জেনারেল সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে গালিবের আচরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। এই অনুসন্ধান-কালে, বাহাদুর শাহের জন্য গালিবের সিক্কা রচনা সম্বন্ধে ব্রিটিশ গুপ্তচরের যে 'রিপোর্ট' ছিল, সেটি প্রকাশ পেয়ে যায়।

এর থেকে কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রকৃতপক্ষে গালিব ব্রিটিশ-বিরোধী না হলেও তিনি বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের পর গভর্নর জেনারেল কর্তৃক তাঁর রাজ-কবি পদে নিযুক্ত হওয়ার সকল সম্ভাবনাই নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কতৃপক্ষ উপরোক্ত দুটি প্রার্থনাই পাঞ্জাবের লেঃ গভর্নরকে জানিয়ে আদেশ দিয়েছিলেন যে লেঃ গভর্নর প্রাদেশিক স্তরে এই দুটি বিষয়েই যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

সাহিত্যিক লোকপ্রিয়তা

গালিবের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাঁকে জীবিকা-নির্বাহের জন্য অবিরত কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছিল —তা সত্ত্বেও সাহিত্য-জগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা দিন দিন বেড়েই চলেছিল। 1857 খ্রীস্টাব্দে রাজনৈতিক বিপ্লব শুরু হওয়ার পূর্বেই তাঁর উর্দু ও ফার্সী কবিতার সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর উর্দু 'দীওয়ান' দুবার প্রকাশিত হয়, 1841 ও 1847 খ্রীস্টাব্দে। ফার্সী 'দীওয়ান' প্রকাশিত হয় একবার 1845 খ্রীস্টাব্দে। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর কাব্য-সংগ্রহের চাহিদা বেড়েছিল, কারণ পুরাতন সংস্করণের পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় এগুলি আর পাওয়া যাচ্ছিল না। বিশেষ করে উর্দু দীওয়ানের চাহিদাটাই ছিল বেশী। উর্দু দীওয়ানের একটা 'কপি' কোনরকমে সংগ্রহ করে গালিব এটি ঘষে মেজে আবার ছাপার জন্য প্রেসে পাঠান। তাঁর নিজের কাছেও এই উর্দু দীওয়ানের কোন 'কপি' ছিল না। যাই হোক, এই নূতন সংস্করণটি 1861 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এই সংস্করণটি সুমুদ্রিত হয় নি। এর অঙ্গ-সজ্জা বা 'টাইপ'এর বিষয়ে কোন যত্ন নেওয়া হয় নি। সবচেয়ে দুঃখের কথা যে এতে ছাপার ভুলও ছিল বেশী। গালিব স্বয়ং একটি 'কপি' যত্ন-সহকারে সংশোধন করে এটি ছাপার জন্য কানপুরের বিখ্যাত নিজামী প্রেসে পাঠিয়েছিলেন। এখান থেকে বইটি পরের বছর অর্থাৎ 1862 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বছরই (1862) লক্ষ্ণৌ-এর প্রসিদ্ধ প্রকাশক মুন্সী নওল কিশোর দিল্লীতে এসে গালিবের ফার্সী দীওয়ানের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশের জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। গালিব কখনও নিজের রচনাগুলি গুছিয়ে সংগ্রহ করে রাখতেন না। গালিবের রচনাগুলি তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু নবাব জিয়াউদ্দীন অহমদ খাঁ ও নজীর হুসৈন মির্জার কাছে সুরক্ষিত থাকত। এঁর মধ্যে

প্রথমোক্ত জন রাখতেন ফার্সী রচনাগুলি আর দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি রাখতেন উর্দু রচনাগুলি। গালিব মুন্সী নওল কিশোরের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে তাঁকে নবাব জিয়াউদ্দীন অহমদ খাঁর কাছ থেকে এগুলি সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। মুন্সী ফার্সী দীওয়ানের পাণ্ডুলিপি নিয়ে লক্ষ্মৌ প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু নানা কারণে এটির মুদ্রণকার্যে বেশ বিলম্ব ঘটেছিল। 1863 খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি অর্থাৎ প্রায় এক বছর পরে এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

গালিবের ফার্সী ও উর্দু 'শায়রী'গুলির একাধিক সংস্করণ থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর খ্যাতি ক্রমশঃই পাঠকসমাজে বেড়ে চলেছিল। মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে চারবার তাঁর রচনার পুনর্মুদ্রণ থেকে বোঝা যায় যে পাঠকসমাজে তাঁর লোকপ্রিয়তা ছিল ক্রম-বর্ধমান, পাঠকেরা তাঁর রচনা পাঠ করার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করা শুরু করেছিল।

রামপুর-যাত্রা

রামপুরের নবাব ইউসুফ আলি খাঁ 1857 খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিক থেকে কাব্য-রচনার ব্যাপারে গালিবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (শাগির্দ)। গুরুর আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ জেনে নবাব গালিবকে রামপুরে এসে বাস করার অনুরোধ জানান। এই সময়ে গালিবের মনে এই আশা খুবই দৃঢ় ছিল যে শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্তন আসন্ন এবং তাঁর সরকারী অনুগ্রহলাভও সুনিশ্চিত।

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি নবাবকে লিখে পাঠান যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া মাত্রই তিনি সানন্দে রামপুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের আশু উন্নতি হবে এই ধারণাটি অবশ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। কতৃপক্ষ তাঁর আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করেন নি। ইতিমধ্যে রামপুর-নবাবের প্রদত্ত বৃত্তি ব্যতীত গালিবের আয়ের সব কটি উৎস রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় পড়ে গালিব স্থির করলেন যে বামপুর-নবাবের স্থায়ী আমন্ত্রণ গ্রহণই হবে তাঁর পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পবিচয়। দিল্লীর জীবনযাত্রাও তখন নিরাপদ ছিল না। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সঙ্গে যাঁরা সম্পর্ক রেখেছিলেন অথবা তাঁর চাকুরিতে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন এমন সব ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে তাঁদের অভিযুক্ত করা হচ্ছিল। যাঁরা গ্রেপ্তার বা অভিযোগ এড়াতে পেরেছিলেন তাঁদেরও নানাভাবে উত্ত্যক্ত করা হত। বিপদের আশঙ্কায় এঁদের সর্বক্ষণ কাটাতে হত। গালিবের বিরুদ্ধে বাহাদুর শার জন্য একটি সিক্কা রচনার অভিযোগ থাকায় তিনিও সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন। এইজন্য তিনি মনে মনে স্থির করেন যে কিছুকাল দিল্লী থেকে দূরে থাকাই তাঁর পক্ষে ভাল। রামপুর-যাত্রার সংকল্প গ্রহণ করাব পিছনে হয়তো আর-একটি কারণ এই ছিল যে তিনি নবাবের কাছ থেকে যখন মাসিক বৃত্তি পান তখন নবাবের আমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য। তবে এর আরও

একটি কারণ এই হতে পারে যে নবাবের মাধ্যমে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় রামপুরের নবাব ব্রিটিশের পক্ষ ত্যাগ তো করেনই নি, উল্টো তাদের দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারকে তিনি নগদ টাকা এমন-কি সৈন্যবাহিনী দিয়েও সাহায্য করেছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এইজন্য নবাবের প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হয়ে রামপুররাজ্যসংলগ্ন উত্তর প্রদেশের কয়েকটি জেলার জায়গীরও তাঁকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। গালিব এ-সব ব্যাপারই জানতেন। নিজের তদানীন্তন দুঃস্থ অবস্থায় তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর উদ্ধারের এক-মাত্র পথ হল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উন্নতির জন্য নবাবের সাহায্য গ্রহণ। এই-সব সাত-পাঁচ ভেবে 1860 খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গালিব রামপুর যাত্রা করেন।

গালিবের কোন জীবিত সন্তান ছিল না। বিভিন্ন সময়ে তাঁর সবসুদ্ধ সাতটি সন্তান জন্মেছিল কিন্তু অতি শৈশবেই তাদের মৃত্যু হয়েছিল, আঠারো মাসের বেশী কোন শিশুই বাঁচে নি। প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রীর এক আত্মীয় জৈনুল আবেদীনকে পোষ্যপুত্র স্বরূপ পালন করেন। জৈনুল একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি বা শায়ের ছিলেন। ইনি 'আরিফ' এই নামে কাব্য রচনা করতেন। 1852 খ্রীস্টাব্দে এই যুবকের মৃত্যু হয় যক্ষ্মা রোগে। ইনি মৃত্যুকালে দুটি ছেলে রেখে যান। গালিবের স্ত্রী এর মধ্যে বড় ছেলেটিকে নিজের কাছে এনে রাখেন, এর নাম ছিল বাকির

আলি খাঁ। ছোট ছেলে হুসেন আলির বয়স তখন মাত্র দু'বছর, এই ছেলেটি গালিবের মালীর কাছেই থেকে গিয়েছিল। কিছু দিন পর এই মালীও মারা যান। তখন ছোট ছেলেটিকেও গালিবের কাছে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। গালিবের স্ত্রী এই দুটি ছেলেকেই মানুষ করেন। গালিব দম্পতির কাছে এই দুটি ছেলেই ছিল নিজেদের নাতির মত। গালিবের রামপুর-যাত্রার সময় এই ছেলে দুটিও তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। গালিব দু'মাসের বেশী সময় রামপুরে বাস করেছিলেন। দিল্লী ফিরে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, রামপুরের জীবন-যাত্রা বেশ স্বাচ্ছন্দ্য-পূর্ণ ছিল, কাজেই গালিব এখানেই দীর্ঘদিন বাসের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে দু'মাসের পরই দিল্লী ফিরতে হয়েছিল, তার কারণ তাঁর সঙ্গী শিশু দুটি অপরিচিত পরিবেশে কষ্ট পাচ্ছিল, ঘরে ফেরার জন্য তারা অধীর হয়ে পড়েছিল।

সম্মান-পুনঃপ্রাপ্তি

গালিবের রামপুরে অবস্থান কালেই নবাব গালিবের হয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট যে সুপারিশ করেন তার ফলে 1860-এর মে মাসে তাঁর নাকচ হয়ে যাওয়া পূর্বের 'পেনসন' আবার দেওয়ার হুকুম জারি হয়।

এটা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে গালিব বার্ষিক 750 টাকা মাত্র পেনসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কেন এত ব্যাকুলতা দেখিয়েছিলেন। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে এটাই ছিল তাঁর

একমাত্র স্থায়ী এবং নিশ্চিত আয়। অন্য কোন আয় ছিল আকাশ-বৃষ্টির ন্যায় একান্তরূপে ভাগ্যের হাতে। কোন একদিন ভাগ্য খুলে যাবে এই আশার উপর ভরসা করে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। জীবন-নির্বাহে একটা কার্যক্রমের প্রয়োজন, একটা নিশ্চিত আয়ের সূত্র না থাকলে এই পরিকল্পনা সম্ভব হয় না। গালিবের ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল ধরে— এই পেনসনটিই ছিল একটি নিশ্চিত আয়— এমন-কি এটি তাঁর বন্ধুমহলে একটি মর্যাদা ও গর্বের বিষয় রূপে পরিগণিত ছিল। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এটি বাতিল হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে গালিব-বিদ্বেষীরা খুশি হয়ে এই নিয়ে হাসাহাসি গল্প-গুজবও করত। এই পেনসন সূত্রে গালিব অনেকটা অবাধে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মহলে যাতায়াত করতে পারতেন। সরকারী দরবারে প্রধান ব্যক্তির দক্ষিণ পার্শ্বের দশম স্থানটি গালিবের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই প্রধান ব্যক্তি কখনও বা থাকতেন গভর্নর জেনারেল কখনও বা প্রাদেশিক লেঃ গভর্নর। সামান্য পেনসনের তুলনায় দরবারে তাঁর নির্দিষ্ট আসনের মর্যাদা ছিল অনেকগুণ বেশি — এটা গালিবের সমসাময়িক কালের বহু ব্যক্তির পক্ষে ঈর্ষা-যোগ্য ব্যাপার ছিল। কাজেই, সহজেই বুঝতে পারা যায় কেন পেনসন অথবা দরবারী সম্মানের জন্য গালিব এতদূর ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

ভারতীয় ফৌজ 1857 খ্রীস্টাব্দের 11 মে মীরাট থেকে দিল্লী এসে পৌঁচেছিল। এর আগেই তিনি এপ্রিল মাসের পেনসনটি পেয়ে গিয়েছিলেন। এখন 1860 খ্রীস্টাব্দের মে মাসে বার্ষিক

750 টাকা করে বকেয়া তিন বৎসরের পেনসন অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে 2250 টাকা তাঁর প্রাপ্য হয়েছিল, এর মধ্যে 400 টাকা 1859-এর মে মাসে তাঁকে অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল। প্রাপ্ত এই টাকা থেকে 150 টাকা তাঁকে কোর্টের ছোট ছোট কর্মচারীদের বখ্‌শিশ দিতে হয়েছিল। যে ব্যক্তি এতকাল ধরে তাঁর খরচ চালিয়ে এসেছে তার কাছে গালিবের দেনার পরিমাণ ছিল 1500 টাকা। তাছাড়াও নানা লোকে তাঁর প্রয়োজনের সময় নানা জিনিস ধারে জুগিয়েছিল, এদের পাওনার পরিমাণ ছিল 1100 টাকা। কাজেই, বকেয়া পেনসনের টাকা থেকে তাঁর সব দেনা শোধ করা সম্ভব হয় নি। যাই হোক, পেনসন পুনঃপ্রাপ্তির ব্যাপার থেকে গালিবের মনে নূতন আশা ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি এখন মনে করলেন— এখনও তাঁর খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর আশা আছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হার্দ্যসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার যে আশা তাঁর মন থেকে বিলীন হয়ে গিয়েছিল সেটি আবার তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। এর পর তিনি আবার নূতন করে চেষ্টা চালাতে লাগলেন যাতে তিনি দরবারে আমন্ত্রণ ও দরবারী 'পোষাক' পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন। আগেই বলা হয়েছে যে— দরবারে আমন্ত্রণের অধিকার তিনি প্রথম পান 1823 খ্রীস্টাব্দে। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে তাঁকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে সর্বোচ্চ সরকারের নিকট পেনসনের আরজি পেশ করতে তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন। দরবারী খেলাতের অধিকার তিনি এর পরবর্তী

কালে পান। এই খেলাত ছিল পুরো মাপের সাতটি বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র, একটি মূল্যবান মণি-খচিত 'শিরপেচ' ও একটি মোতির মালা বা হার। দরবারে উপস্থিত থাকার সময় রাজ-প্রতিনিধিকে কোন উপঢৌকন (নজর) তাঁকে দিতে হত না। এর পরিবর্তে রাজ-প্রতিনিধির প্রশস্তিমূলক একটি 'গজল' শুধু তাঁকে পড়তে হত।

পূর্বাবস্থা ফিরে এলেও গালিবের আর্থিক অসচ্ছলতা থেকেই গিয়েছিল। এর থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোন পথই তাঁর ছিল না। এরই মধ্যে তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক নবাব ইউসুফ আলি খান 1865 খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কর্কট রোগাক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করলেন।

কল্‌ব আলি খান

নবাব ইউসুফ আলি খানের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নবাব কল্‌ব আলি খান তাঁর উত্তরাধিকারী হন। নূতন নবাব ও তাঁর শোকগ্রস্ত পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য গালিবকে রামপুর যেতে হয়েছিল। সম্ভবতঃ সমবেদনা জ্ঞাপন ছাড়াও এই দ্বিতীয়-বার রামপুর-যাত্রার আরও একটি কারণ ছিল। 1859 খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাস থেকে গালিব রামপুর দরবার থেকে নিয়মিত মাসিক 100 টাকা বৃত্তি পেয়ে আসছিলেন।

গালিবের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে এটা বহাল থাকবে কি না। নবাব ইউসুফ আলি খান ছিলেন তাঁর শিষ্য। উর্দু

কাব্য রচনায় তিনি গালিবের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাঁকে যে মাসিক সাহায্য দেওয়া হত এটা যেন ছিল একটা কাজ করার পারিশ্রমিকের মত। গালিব বা নূতন নবাবের মধ্যে এমন কোন আদানপ্রদানের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। নূতন নবাব তাঁর 'সাগ্‌রেদ' নন, সুতরাং বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে তাঁর একটা যুক্তি থাকতে পারে। বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেলে গালিবের খুবই কষ্ট হওয়ার কথা। এই সব কারণে গালিবের পক্ষে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। এই সাক্ষাতের ফলে বৃত্তি বন্ধের সম্ভাবনা হয়তো রোধ করা যাবে। এই-সব ভেবে গালিব নূতন নবাবের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে রামপুরে এসেছিলেন। নূতন নবাব তাঁকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছিলেন যে তাঁর বৃত্তি অব্যাহত থাকবে। এই আশ্বাস নিশ্চয়ই গালিবের উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়েছিল।

তাঁর রামপুরে বাসকালেই তিনি পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে এই মর্মে একটি চিঠি পেলেন যে তাঁর 'দস্তম্বু'র একটি 'কপি' যেন মুখ্য-সচিবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গালিব ইতিপূর্বেই ভারত-গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করেন যেন তাঁর লিখিত সিপাহী-বিদ্রোহের বিবরণীটি তাঁরা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। রামপুরে থেকে তিনি এই বইয়ের যে কপিটি সংগ্রহ করতে পারেন সেটির অবস্থা গভর্নমেণ্টের কাছে প্রেরণের উপযোগীই ছিল না। গালিব আশা করেছিলেন যে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত বা প্রচারিত হলে এই বই থেকে তাঁর বিশেষ বৈষয়িক লাভ হবে

এবং সামাজিক মর্যাদাও বেড়ে যাবে। এই কারণে তিনি একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি 'কপি' সংশোধিত করে সেটি ছাপানোর জন্য বেরেলীতে কয়েকজন বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দেন। এই দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হওয়ার পর এর একটি কপি তিনি পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাঞ্জাব সরকার এই বইটির সম্বন্ধে এক বিশেষজ্ঞের মতামত চেয়ে পাঠান। এই বিশেষজ্ঞ সম্ভবতঃ এই পুস্তকের বিষয়বস্তুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি, এর লিখন শৈলীও তাঁর মনোমত হয় নি। ইনি একটি প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে এর ভাষা পুরানো ফার্সী, এর বেশীর ভাগ আরবী শব্দই এখন অপ্রচলিত কাজেই তা দুর্বোধ্য।

তাঁর নিজস্ব অন্তিম রিপোর্টে গভর্নর জেনারেল জানিয়েছিলেন যে গালিবকে তাঁর নিজের দরবারের সভা-কবি নিযুক্ত করা সম্ভব নয় তবে পাঞ্জাবের গভর্নর ইচ্ছা করলে সহানুভূতির সঙ্গে গালিবকে তাঁর সভা-কবি নিযুক্ত করার প্রস্তাব বিবেচনা করতে পারেন। তিনি ইচ্ছে করলে তাঁকে বিশেষ 'খেলাত' দিতে পারেন, তাঁর নিজস্ব দরবারে তাঁর জন্য উচ্চতর সম্মানযুক্ত আসনেরও ব্যবস্থা করতে পারেন। এটা নিশ্চিতভাবে জানানো হয়েছিল যে সরকারী অর্থে 'দস্তম্বু' প্রকাশ বা প্রচারের কোন প্রয়োজন আছে বলে সরকার মনে করেন না। এইভাবে গালিবের আর-একটি আশায় ছাই পড়েছিল।

এইবার গালিব রামপুরে ছিলেন প্রায় দশ-সপ্তাহ কাল।

1865 খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে তিনি দিল্লী যাত্রা করেন। পথে তিনি একটি বেশ বড় দুর্ঘটনায় পতিত হন। তখন অতি বর্ষণের ফলে নদীগুলি বন্যাক্রান্ত হয়েছিল। মোরাদাবাদ পৌঁছাতে তাঁর রামগঙ্গা নদী পার হবার দরকার ছিল। এক সারি নৌকারূপ সেতুর উপর দিয়ে ছিল এই নদী-পারাপারের ব্যবস্থা। তিনি একটি পাল্কীতে চড়ে যাচ্ছিলেন, মালপত্র ও ভৃত্যেরা আসছিল গোরুর গাড়ীতে। সেতু পার হতে না হতেই একটা প্রবল জলস্রোত এসে সেতুটি বিপর্যস্ত করে দেওয়াতে গালিব তাঁর সহযাত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কোন রকমে তিনি পরবর্তী গন্তব্য স্থান— মোরাদাবাদ পৌঁচেছিলেন। বর্ষা সত্ত্বেও তখন ছিল শীতকাল। রাত্রে শীতের প্রকোপ তীব্র হয়ে উঠত। আরও মুশকিলের কথা এই হয়েছিল যে তাঁর সঙ্গে উপযুক্ত শীত-বস্ত্র বা বিছানা কিছুই ছিল না। গালিবের শরীর আগে থেকেই খারাপ যাচ্ছিল, এই অবস্থায় তাঁর শরীর আরও খারাপ হয়ে গেল, তিনি গুরুতররূপেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালে শহরে খবর রটে গেল যে মির্জা গালিব শহরের একটি 'সরাই'এ আশ্রয় নিয়েছেন। খবর পেয়ে তাঁর পরিচিত একজন সাব-জজ সরাই-এ এসে তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তিনি গালিবের পক্ষে অত্যাবশ্যক চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করেছিলেন আর তাঁর জন্যে যা যা করা দরকার সবই করেছিলেন। পাঁচ দিন পর তাঁর শরীর একটু সুস্থ হয়। পথশ্রম সহ্য করার মত অবস্থায় এসে গালিব আবার দিল্লীর পথে অগ্রসর

হন। 1866 খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে গালিব দিল্লী ফিরে আসেন।

এই দুর্ঘটনা গালিবের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে দিয়েছিল। তাঁর রামপুর-ভ্রমণ থেকেও আর্থিক কোন সুরাহা মেলে নি। রামপুর যাত্রার অনেক আগে থেকেই তাঁর শরীর ভেঙে এসেছিল, পথকষ্ট সহ্য করার শক্তি তাঁর ছিল না। অবস্থার চাপে পড়েই তাঁকে এই দুর্গম পথযাত্রার ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। পাওনাদারদের কাছে তাঁর প্রচুর দেনা জমে গিয়েছিল, এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র পথ ছিল রামপুর দরবারের বদান্যতা। নবাব কল্‌ব আলি খান্‌ নিজে ছিলেন সুশিক্ষিত পুরুষ। জ্ঞানী-গুণী ও কবিদেরও তিনি সাহায্য করতেন। গালিব সুদীর্ঘকাল ধরে রামপুর দরবারের সভা-কবি ছিলেন। কল্‌ব আলি খানের পিতা পরলোকগত নবাবের সঙ্গেও গালিবের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল।

এ ছাড়াও আর-একটা কথা এই ছিল যে প্রাচ্য দেশের প্রথানুযায়ী রাজ্যের 'গদি' প্রাপ্তি বা রাজ্যাভিষেকের সময় যিনি 'গদি' পান বা সিংহাসনে আরোহণ করেন তিনি এই উপলক্ষ্যে রাজ-পরিবার বা রাজ-দরবার সংশ্লিষ্ট সকলকেই প্রচুর অর্থ দান করে থাকেন। গালিব নিশ্চিতই ভেবেছিলেন যে রামপুর নবাবের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষ্যে রামপুরে উপস্থিত থাকলে তিনি নূতন নবাবের কাছে থেকে বেশ মোটা রকমের টাকা উপ-ঢৌকন পেয়ে যাবেন। এই টাকা থেকে তাঁর সব দেনা শোধ না হলেও অধিকাংশ দেনা শোধ হয়ে যাবে, অর্থাভাব অনেকটা দূর

হবে। বস্তুতঃ, শিল্প-সাহিত্যের উৎসাহদাতা বা উদারহৃদয় হওয়া সত্ত্বেও অর্থের বিষয়ে নূতন নবাব খুব সতর্ক থাকতেন। নবাব বহু লেখক ও কবি পরিবৃত হয়ে থাকতেন, কিন্তু তিনি বেশ দৃষ্টি রাখতেন যে এঁদের মধ্যে যাঁদের দরবার থেকে সাহায্য করা হত তাঁরা যেন বিনিময়ে কোন-না-কোন একটা সরকারী কাজের দায়িত্ব নিয়ে তা যেন যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ শুধু কবিতা লেখার জন্য বা ছবি আঁকার জন্য কাউকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেওয়া হত না, কিছু কাজও প্রাপকদের করতে হত। নবাবের মনোভাব যখন এইপ্রকার ছিল তখন গালিবকে যে নিরাশ হতে হয়েছিল এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রামপুরে আসার পর গালিবের প্রতি কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয় নি, মোটা টাকাও তিনি পান নি। রাজ্যাভিষেক দরবার উপলক্ষ্যে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল মাত্র 1000 টাকা। ফেরার আগে তাঁকে রাহা খরচ হিসাবে আরও দু'শত টাকা দেওয়া হয়েছিল।

একে তো এই অবস্থা, তার উপর গালিবের দিল্লী ফেরার পর দুজনের মধ্যে একটা মনোমালিন্যের ঘটনাও ঘটেছিল। তরুণ নবাব গালিবের কাছে একটা ফার্সী গদ্য রচনা পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে এটা একটা বইয়ের ভূমিকারূপে তিনি ব্যবহার করতে চান, এটা ঠিকভাবে লেখা হয়েছে কিনা। এই রচনায় নবাব এমন কিছু 'মুহাবরে' বা শব্দাবলী প্রয়োগ করেন যা ভারতে প্রচলিত থাকলেও ফার্সীর প্রাচীন পণ্ডিতদের অনমু-

মোদিত। গালিব এইগুলি সংশোধন করে পাঠান। নবাব যখন সংশোধিত রচনাটি পেয়ে পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি এই পরিবর্তনের কারণ কী তা জানবার জন্য গালিবের কাছে পত্র লিখলেন। যে শব্দাবলী পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলি যে কোন কোন ভারতীয় ফার্সী লেখক একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন— সে কথাও তিনি গালিবকে জানালেন। গালিব সারা জীবনে ভারতীয় ফার্সী লেখকদের মর্যাদা কোনদিন স্বীকার করেন নি, তাঁর মতে এঁরা ফার্সী লেখকই নন। এঁদের নজীর তুলে ধরায় গালিব রূঢ় ভাষায় এঁদের বিদ্যা-বুদ্ধির নিন্দা প্রকাশ করেন। এঁদের মত নবাব প্রামাণ্য বলে মনে করায় পরোক্ষভাবে এর দ্বারা নবাবের বিদ্যা-বুদ্ধিরও নিন্দা করা হয়েছিল। নবাব ছিলেন পরম্পরাবাদী। তাই গালিবের চিঠির সুর ও ভাষা তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছিল। দুজনের মধ্যে দুঃখজনক বাদ-প্রতিবাদের পালা এরপর চলতে থাকে। গালিব এতে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, তাঁর ভয় জন্মেছিল যে এর ফলে তাঁর মাসিক বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে। ভয় পেয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত নবাবের যুক্তিই মেনে নিলেন। কল্‌ব আলি খাঁন তাঁর পক্ষ থেকেও বাদ-প্রতিবাদ হঠাৎ বন্ধ করে দেন। তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত গালিবকে জব্দ করার জন্য মাসিক বৃত্তি বন্ধ করেন নি। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরিণাম এই দাঁড়িয়েছিল যে গালিব ও নবাবের মধ্যে সাহিত্য-সংক্রান্ত কোন পরামর্শ বা সহযোগিতার পালা চুকে গিয়েছিল। এমন আরও কয়েকটি

ঘটনায় দুজনের মধ্যে আরও অপ্রীতির ভাব জন্ম নিয়েছিল। এই অবস্থায় নবাবের কাছ থেকে কোন বাড়তি 'প্রাপ্তি' গালিবের ভাগ্যে ঘটে নি। দুজনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক অবশ্যই শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল, তবে আগেকার মত সে সম্পর্ক আর প্রীতিপূর্ণ ছিল না।

দেহান্ত

এখন কবি নশ্বর জীবনের শেষ পরিণতির পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর শারীরিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না। রামপুর থেকে দিল্লী ফেরার পথে যে দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে তা তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই সময় আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য— জীবনযাত্রার যে উচ্চ মান তিনি আজীবন বজায় রেখে-ছিলেন তা চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হচ্ছিল না। বাল্য ও যৌবনকালে তিনি ভোগ বিলাস, এমন-কি বেপরোয়াভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। বয়স যখন বাড়ল, তখন আয় অবশ্য কমে গিয়েছিল, ব্রিটিশ সরকার ও রামপুর নবাব-প্রদত্ত বৃত্তির মধ্যেই তা সীমায়িত ছিল। ইতিমধ্যে তাঁর দায়-দায়িত্বও বহু গুণ বেড়ে গিয়েছিল, বিশেষভাবে জৈনুল আবেদীনের ছেলে দুটি আসার পর থেকে। গালিব একাধিক রোগেও আক্রান্ত হয়ে-ছিলেন। পুরাতন কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগ থেকে নানা রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। 1862 ও '63তে তাঁর শরীরের নানা স্থানে

ক্ষত ও বিস্ফোটক দেখা দেয়, এদের প্রকোপে তাঁর শরীর খুবই ভেঙে যায়। এর আক্রমণ থেকে সামলে উঠতে না উঠতেই 'হার্নিয়া' রোগে তিনি আক্রান্ত হন, সম্ভবতঃ তাঁর দেহে বহুমূত্র রোগেরও কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর আহার্যের পরিমাণও হয়ে গিয়েছিল খুব অল্প। অধিকাংশ সময়ই তিনি ঘরের মধ্যে কাটাতেন, বাইরে যেতে পারতেন না। এই অবস্থায় প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখার কাজ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সারা-জীবন যে সাহিত্য-চর্চায় অতিবাহিত হয়েছে সে সাহিত্য-চর্চার সাধ্যও তাঁর ছিল না। এই কারণে তিনি দিল্লীর দুটি বহুল-প্রচারিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এই মর্মে ঘোষণা প্রচার করেন যে এটা তাঁর পক্ষে গভীর পরিতাপের বিষয় যে সাহিত্য-সেবা তাঁর দ্বারা আর সম্ভব নয়, তাঁর বন্ধু ও শিষ্যবর্গের প্রতি তাঁর অনুরোধ তাঁরা যেন তাঁদের কোন রচনা তাঁকে সংশোধন উদ্দেশ্যে আর না পাঠান। গালিবের এই অনুরোধে কেউ কর্ণপাত করেন নি। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে চিঠিপত্র লিখতেন, এবং গালিবকে তার জবাবও দিতে হত।

শেষ অবস্থা ঘনিয়ে এসেছিল। দুর্বলতা বেড়েই যেতে লাগল। মাঝে মাঝে তিনি চৈতন্য-হীন হয়ে পড়তে লাগলেন। কোন শক্ত খাদ্য খাওয়ার শক্তি তাঁর আর রইল না। 1869 খ্রীস্টাব্দের 14ই ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্যের এই শোচনীয় অবস্থায় তিনি সন্ন্যাস বা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞা হারালেন। তখনকার দিনের সর্বোত্তম চিকিৎসাতেও কোন ফল

হ'ল না। তার পরের দিন 1869 খ্রীস্টাব্দের 15ই ফেব্রুয়ারি মধ্যাহ্নের কিছু পরেই গালিব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ঐ দিনই সন্ধ্যায় তাঁর মরদেহ নিজামুদ্দীন নামে ছোট এক গ্রামে নিয়ে গিয়ে লোহারুবংশীয়দের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়। এইভাবে ভারতের শেষ 'ক্লাসিক' ফার্সী কবি ও উর্দু ভাষায় নূতন কাব্য-রীতির দিশারী পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেই পরবর্তী কবিগণ উর্দু কাব্য-ধারাকে উচ্চমার্গে সমাসীন রাখতে পেরেছিলেন।

॥ 2 ॥

গালিবের কলা

গালিব এগারো কি বারো বছর বয়সে অতি শৈশবকালেই লেখা শুরু করেন। প্রথমে উনি 'আসাদ' এই ছদ্ম বা উপনাম ব্যবহার করতেন। এটা হল আসাদুল্লা খাঁ এই পুরা নামের অংশ-বিশেষ। কিছু কাল পরে তিনি জানতে পারেন যে আর-একজন লেখকও এই ছদ্ম-নাম বা 'তখল্লুস'টি ব্যবহার করছেন। বিভ্রান্তি এড়াতে তিনি নিজে গালিব এই 'তখল্লুস' গ্রহণ করেন। এই নাম নির্বাচনের কারণ কতকটা স্বাভাবিকই ছিল কারণ হজরত মুহম্মদের জামাতা আলির এক উপাধি ছিল আসাদুল্লাহ্ অল্ গালিব। এই সময়ে তিনি যে ফার্সী ভাষাতেও লিখতেন তার প্রমাণ থাকলেও এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি উর্দুতেই লিখতেন বেশী।

1821 খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁর উর্দু কবিতার সংখ্যা এত বেশী হয়েছিল যে তাঁর নিজস্ব কবিতা-সংগ্রহ থেকে একটি 'দীওয়ান' প্রকাশ করা যেত। প্রথম দিকে তিনি এমন কয়েকজন ফার্সী কবির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যাঁদের রচনা ছিল অবাস্তব বিষয়ধর্মী এবং শৈলী ছিল কষ্ট-কল্পিত। গালিবের এই সময়ের রচনায় এই দোষগুলির সমাবেশ দৃষ্ট হ'ত।

এই ব্যর্থ পথ অনুসরণ করতে নিষেধ করার মত লোক অবশ্যই গালিবের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। গালিব ছিলেন অত্যন্ত জেদী ও দাম্ভিক প্রকৃতি-সম্পন্ন, বন্ধুদের এই বিরূপ সমালোচনা তিনি মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে অভ্যস্ত ছিলেন না। অনেক বৎসর পরে যখন তিনি দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তখন তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধু তাঁকে লেখার ধরন বদলে এমন কতকগুলি উর্দু 'দীওয়ান' নির্বাচন করতে অনুরোধ করেন— যেগুলি সাধারণ পাঠক আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতে পারবে। বন্ধুদের বন্ধুজনোচিত ও অকপট পরামর্শ উপেক্ষা না করতে পেরে গালিব তাঁর আগের দীওয়ান থেকে বহু কবিতা ছেঁটে ফেলেন, যাতে বাকী অংশটুকু সকলের পক্ষে হৃদ্যতর হতে পারে।

এই 'দীওয়ান' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় 1841 খ্রীস্টাব্দে। এর প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে একটা যুগান্তর এনে দিয়েছিল। মাত্র 1100টি দুই-লাইনের কবিতা-যুক্ত এই ছোট পুস্তকটি সাধারণ ভাবে উর্দু ভাষার ও বিশেষভাবে উর্দু কাব্যের উপর কী সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল তা ভাবলে বিস্মিত বোধ করতে হয়। এই ঘটনার পর গালিব আরও আঠাশ বৎসর বেঁচে ছিলেন। এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে এই দীওয়ানের দ্বিপদীর সংখ্যা 1800 অতিক্রম করে নি।

উর্দু ভাষা সাক্ষাৎ ভাবে একাধিক ভারতীয় ভাষা থেকেই জন্মলাভ করেছে। বিশেষ ভাবে খড়ী-বোলী ও হরিয়ানী ভাষা থেকেই এর উদ্ভব। এর ফলে উর্দু ভাষার শব্দভাণ্ডার-এর অধিকাংশই ভারতীয় সূত্র থেকেই এসে গিয়েছিল। এদেশে মুসলমানদের আসার ফলে যে ফার্সী ভাষা প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল, সেই ভাষার লিপিটিই অবশ্য এই ভাষায় গৃহীত হয়ে গিয়েছিল। উর্দু ভাষার প্রাথমিক যুগের লেখকেরা সবাই ছিলেন ফার্সী ভাষায় কৃত-বিদ্য, এঁদের মধ্যে ধার্মিকতার ভাবও প্রবল ছিল। নূতন ভাষা উর্দুর মাধ্যমে লেখার সময়ে এই লেখকেরা ফার্সী ভাষার 'ক্লাসিক' লেখকদের লিখনরীতিই অনুসরণ করতেন। ফার্সী কাব্যধারা গজল, কসীদা ও মসনবী এই তিন ধারায় প্রবাহিত।

'শায়রী'র এই ত্রিধারার মধ্যে বিশেষভাবে গজলের উপজীব্য বিষয় হল প্রেম, সুরা ও রহস্যবাদ। উর্দু কাব্যের উদ্ভবের বহু পূর্ব থেকেই 'শায়রী'র আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি ধারণা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উর্দু ভাষার কবিকুল প্রথম থেকেই কাব্যের এই আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধীয় ধারণার প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি, তাঁরা এই রীতিরই অনুসরণ করতেন। কাজে কাজেই এঁদের রচনায় কৃত্রিমতা ও অবাস্তবতা থেকেই যেত। এ-বিষয়ে কবিদের নিজস্ব অনুভূতি বলতে আর কিছু পাওয়া যেত না। এই ত্রুটি সত্ত্বেও একজন উর্দু কবি যেন 'সবজান্তা'র ভাব নিয়ে কলম ধরতেন। সবচেয়ে হতাশাজনক

ব্যাপার ঘটত এই যে— জীবনের অন্য নানাবিধ সমস্যাগুলির সম্বন্ধে এঁদের কোন বক্তব্যই থাকত না— সে সম্বন্ধে এঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রেম, সুরা বা রহস্যবাদ এ-বিষয়গুলি অবশ্যই নিজ নিজ ক্ষেত্রে আলোচনাযোগ্য বস্তু হতে পারে। তবে শুধু এই বিষয়গুলি নিয়েই জীবন নয়, এরাই জীবনের সব-কিছু হতে পারে না। এই সঙ্কীর্ণচিন্তার পরিণাম এই হয়েছিল যে আমাদের প্রাথমিক যুগের উর্দু কবিগণ সবাই নিজের নিজের কল্পিত এমন এক জগতে বাস করতেন যার সঙ্গে বাস্তব জীবনযাত্রার কোন সম্পর্কই ছিল না।

এই অবস্থায় প্রথম যে কবি বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করলেন তিনি হলেন গালিব। প্রথমে তিনিও তাঁর পূর্বগামীদের মতই কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয় নিয়ে লেখা শুরু করেন। কিছুদিন পরেই তিনি এই শ্রেণীর রচনার অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করে কাব্যধারাকে এক নূতন যুক্তিগ্রাহ্য ও সহজ পথে প্রবাহিত করার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। তাঁর কাব্যের উপজীব্য হল— জীবন ও তার নানা সমস্যা; মানুষ ও বিশ্বাস-সমূহ, অন্তর্লীন ভাবস্রোত, প্রেম এবং তার মনোবিজ্ঞান-সম্মত প্রতিক্রিয়া-সংঘাত এমনি আরও অনেকানেক বিষয়— আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে উপলব্ধ অনুভূতি ইত্যাদি। এইভাবে তাঁর শায়রী হয়ে উঠল আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক অনুভূতি-গুলির ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই এই

কবিতাগুলি পড়ে পাঠকেরা অধিকতর সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করতে পেরেছিলেন। তবে এ-কথাও স্বীকার্য যে গালিবের পক্ষে দুই শত বৎসর ধরে অনুসৃত পূর্বগামীদের দ্বারা স্থাপিত এই পরম্পরা নিঃশেষে ছিন্ন করা সম্ভব হয় নি। গালিবের 'দীওয়ানে' আমরা এমন অনেক কবিতার সমাবেশ দেখতে পাই যেগুলি অবাস্তবতা-দোষ-দুষ্ট, গালিব এই অবাস্তবতার দোষটুকু পূর্বগামী কবিদের কাছ থেকে ঐতিহ্য-সূত্রেই লাভ করেছিলেন। কাল্পনিক ও ভ্রমাত্মক লিখন-রীতির নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম করে— গালিব এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটি নূতন কাব্য-রীতির প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন— তাঁর বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য এইখানেই। গত শতাব্দীতে উর্দু কাব্য প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করে অতি উচ্চ-কোটিতে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে উর্দু কাব্যের এই সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ এবং পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি। তবে এ-কথা আমাদের পক্ষে মনে রাখা প্রয়োজন যে সর্বপ্রথম গালিবই একটি পুরানো বন্ধন ছিন্ন করে আমাদের কাছে জ্ঞান ও বিচারনিষ্ঠ এক অজ্ঞাত জগতের সন্ধান এনে দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন বিষয়ের উপর গালিবের চিন্তা-ভাবনা ও কবি-কৃতির কিছু নিদর্শন এখানে সন্নিবিষ্ট করা হ'ল।

গালিব থেকে নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ

ঈশ্বর

দুর্জ্ঞেয়তমের রহস্য-ভাণ্ডারের সন্ধান তো তোমার জানা নেই।
তা যদি জানা থাকত,
তবে দেখতে পেতে প্রতিটি অবগুণ্ঠনের অন্তরালে ধ্বনিত
তাঁরই সেই এক স্বর।
তাঁর এই লুকোচুরি তাঁর সৌন্দর্য এত বাড়িয়েছে যে তা
বর্ণনার অতীত।
কেশগুচ্ছের চেয়েও এই অবগুণ্ঠন তাঁকে অধিকতর
শ্রীমণ্ডিত করেছে।

কে তাঁকে দেখতে পায়? যিনি অদ্বৈত ও তুলনা-রহিত।
দ্বিত্বের ছিটে-ফোঁটাও যদি সম্ভব হত, আমরা তাঁকে দেখতে
পেতাম কোথাও না কোথাও।

যখন কোথাও কিছু ছিল না, ঈশ্বর অবশ্যই ছিলেন।
যদি এমন হয়— কোথাও কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না,
তবু থাকবেন ঈশ্বর।
আমিই তো আমার সর্বনাশের মূলে,
'আমি' না থাকলে কার কি এসে যায়?

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আসে শিশিরকণা ঢলে পড়ার পালা;
আমার অস্তিত্বের অবসান তোমার প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টিপাতে।

আমার প্রভু ধরাছোঁয়ার বাইরে, বুদ্ধির অগোচর,
যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা জানেন 'কিবলা' বা 'কাবা'
শুধু আসলের রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারে,
নিজে সে আসল নয়।

তাঁর রূপ-সজ্জার শেষ নেই,
অবগুণ্ঠনের বাইরেও রয়েছে তাঁর সামনে আরশি,
এরই সামনে প্রতিনিয়ত চলে রূপ-সজ্জায় পরিবর্তনের খেলা।

পথিক দলের মধ্যে কেউ না কেউ,
একটি না একটি পান্থশালায় পৌঁছে,
ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ে, আর এগিয়ে যেতে পারে না।
তোমার কাছে যারা পৌঁছাতে পারে না,
তাদের কি আর উপায় থাকে বল ?

প্রতিটি অণু-পরমাণুর উন্মত্ত নর্তনের কৈফিয়ৎ কে দেবে ?
বিশ্বচরাচরকে এমন মহিমায় পরিপূর্ণ করেছেন তিনি।
তাঁর সব কিছুই অনিত্যের ঘূর্ণীপাকে বাঁধা।

নিজের কাছ থেকেই তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করবে,
সব কিছুই বুঝতে নাই বা পারলে।

এক ঈশ্বরেরই প্রকাশ বহু ভাবে, আমরা এই কথা বলে থাকি,
এটা একটা অন্ধ-কল্পনার অনুসরণ মাত্র ;
সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের কল্পনার এই দেবতারা
আমাদের অবিশ্বাসী 'কাফির' করে তোলে।

সকল বস্তুতেই তো তুমি রয়েছ,
তবু তোমার মত কিছুই কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

ধর্ম

অপবিত্রতা না থাকলে পবিত্রতা আসবে কোথা থেকে ?
বসন্ত-ঋতুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলনের আধার রূপে
একটি উদ্যানের প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা একেশ্বর-বাদী, আচার-অনুষ্ঠান বর্জন আমাদের ধর্ম।
মতবাদের কুয়াশা অপসৃত হলে, তখনই দেখা দেয় ধর্মের
প্রকৃত স্বরূপ।

আমাদের প্রার্থনা শুধু সুরা ও মধুর জন্য যেন না হয়,
এর জন্য দরকার স্বর্গকে নরকে ঠেলে দেওয়া।

জীবনে মহৎ কিছু করার সুবর্ণসুযোগ পেয়েও যে হারিয়েছে
তাকে সান্ত্বনা দেবার মত কিছু নেই,
যদিও হয়তো সে সুযোগের সময়টুকু প্রচুর-প্রার্থনাতেই
কাটিয়েছিল।

ধর্মের মূল কথাই হ'ল ঐকান্তিক ভক্তি,
মন্দিরে জড়-দেবতার পূজা করতে করতেই যে ব্রাহ্মণের
মৃত্যু হয়েছে,
তার সমাধির উপযুক্ত স্থান পবিত্র কাবা মসজিদ,
কারণ সে ভক্তিমান্।

বেহেস্তের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ, বেহেস্ত হয়তো সত্যিই
খুব ভাল জায়গা ;
ঈশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা— সেখানে যেন তোমার
দেখা পাই ।

যে মূল্যবান জীবনের অবসান হয়ে গেল এ পারে,
তার ক্ষতি পূর্ণ হয়ে যায় বেহেস্তে ।
কিন্তু এটা কি সত্যি পুরস্কার !
কোথায় নেশার আনন্দ আর কোথায় অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা ।

বেহেস্তের আসল খবর আমার জানা আছে ।
তবে মন খুশি রাখতে গেলে এমন চিন্তায় তো আনন্দ আছে ।

হে ঈশ্বর, যে পাপ কাজ করেছি, তার শাস্তি দিতে চাও দিয়ো।
তবে যে পাপ-কাজের চিন্তা করেছি, কিন্তু যা করতে পারিনি,
তা আমাকে হতাশা-বিদ্ধ করেছে । এই হতাশা ভোগের জন্য
কিছু রেহাই তোমার কাছে আমার পাওনা ।

এটা কি সত্যি প্রয়োজন, যে সবাই পাবে এক হতাশাজনক
জবাব ?
চল তো দেখি, আমরা সবাই সিনাই পাহাড়ে চলে যাই ।
দেখি ভাগ্যে কি মেলে ?

ধার্মিকতার কেন প্রশংসা করব ?
যদিও হয়তো এটা খাঁটি, লোক-দেখানো নয় ।

ভাল কাজের পুরস্কার পাবার পিছনে,
পুঞ্জীভূত লোভের প্রকাশ জড়িত কি নেই ?

রহস্য-বাদ

ভালবাসার ছলা কলা আর নয়নের চাতুরী
ভাষায় যদি প্রকাশ করতে হয় এর উপমা দেওয়া চলতে
পারে,
ছোরা ও ছুরির সঙ্গে।
ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা যদিও ওঠে,
এতেও এসে পড়বে পান-পাত্র আর মদিরার প্রসঙ্গ।

দর্শন, দ্রষ্টা ও দৃষ্ট-বিষয়— মূলতঃ এগুলো সব একই।
আমি ভেবে পাই না তাই, 'দেখা'কে এদের মধ্যে কোন্
শ্রেণীতে ফেলব।

মহাসমুদ্রের পরিচয় তার নিয়ত রূপ-পরিবর্তনে,
তা যদি না হত তবে জলকণা, জলের ঢেউ আর বুদ্বুদের
মূল্য আর কতটুকু ?

যা দেখেছি— এটা একটা নিতান্ত রহস্য
এটা যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতেও স্বপ্ন থেকে জেগে উঠা।

বাইরের চটক দেখে ভুলো না,
এরা কেউ বলে এটা ঠিক, কেউ বলে ঠিক নয়।

আমার কাছে এ সংসার ছেলে-খেলা,
দিবা-রাত্রি আমার সামনে চলছে এই খেলা।
সলোমনের সিংহাসন আমার কাছে শুধুই খেলনা,
ঈশার চমৎকারিত্ব শুধু বাক্-বিলাস।

বিশ্ব-সৃষ্টি আসলে কিছুই না, একটা শুধু নাম ;
যা আমরা চোখে দেখি, তা শুধু কল্পনা-বিলাস।

আমার ধর্ম বিশ্বাস আমাকে বেঁধে রাখতে চায়,
অবিশ্বাস আমাকে বিপথে টানে।
পবিত্র কাবা আমার পিছনে পড়ে থাকে, সামনে এসে পড়ে গীর্জা।

জীবন

আসাদ, সংসারকে চিনে রাখ,
প্রেমিকার জন্য যে ফরহাদ পাথর ফুঁড়েছিল,
লোকাচারের শৃঙ্খল সেও ভাঙতে পারেনি।
আত্ম-হননের কাজে তাকে চির-পুরাতন প্রথায়
কুঠার ব্যবহার করতে হয়েছিল।

এ জীবনে কেউ কি কারো বিশ্বস্ততা পেয়েছে ?
নিশ্চয়ই না, এটা শুধু কথার কথা,
বিশ্বস্ততার কাজ কেউ কখনো করেনি।

আমার বন্ধুরা সবাই হয়ে গেল উপদেষ্টা,
হায় এটা কেমন বন্ধুত্ব !
আমার কত ভাল লাগত, যদি কেউ আমায় দেখাত একটু
সহানুভূতি,
যদি কেউ আমায় আমার লক্ষ্য-সাধনে
একটুখানি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসত !

জীবনের যন্ত্রণাগুলোকে ছোট করে দেখো না,
এর একটা একটা কণিকা— পাথরেরও রক্ত নিঙড়িয়ে
তাকে নিঃশেষ করে দেবার সামর্থ্য রাখে ।

যন্ত্রণা জীবনের আয়ু কেড়ে নেয়,
কিন্তু যার হৃদয় আছে তার আর বাঁচার পথ নেই ।
প্রেমের বেদনা যদি না থাকত
তবে এ জীবন কাটতই বা কেমন ভাবে ?

বসন্ত ঋতু যে শরৎকালের পায়ে পায়ে 'হেনার' মত,
জীবনের স্রোতে চলমান প্রতিটি সুখ রেখে যায় একটি ক্ষত
একটি চিরস্থায়ী যন্ত্রণা ।

গালিব, আমার এই বিপদে কেউ যদি আমার সহায়তা করত,
তবে আমি কতই না কৃতজ্ঞ বোধ করতাম ;
গিঁট যখন খোলার মত নয়,
তখন আমার আঙুল দিয়েও তা করা যেত ।

আমি যন্ত্রণা যখন অনুভবই করি না,
আমি যখন নিঃসাড়, তখন আমার মাথাই কাটা যাক্ না,
তাতে ক্ষতি কি ?
আমার মাথা যদি না কাটা যেত,
তবে ওটা আমার জানুতে নত হয়ে পড়ত।

একটা জল-কণার পরম আনন্দক্ষণ তখনই,
যখন এটা নদী-জলে বিলীন হয়ে যায়।
যন্ত্রণা যখন সীমা ছাড়ায়
তখনই তার অবসান ঘটে।

আমার যা কিছু ছিল প্রেম তা গ্রাস করেছে,
এতে আমি লজ্জিত।
আমার আর কিছুই নেই,
শুধু আছে এক অপূর্ণ ইচ্ছা,
আবার সব কিছু ফিরে পাওয়ার।

জীবন ও যন্ত্রণা এ দুয়েরই একই অর্থ ;
যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায়, যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ
কোথায়।

তুমি কি ঈর্ষার অনলে জ্বলে যাচ্ছ ?
জীবনের পথে বেড়িয়ে পড়,
অনেক কিছু দেখতে পাবে,

অনেকের সাথে হবে চেনা-জানা, মেলা-মেশা,
তখন তোমার চোখ খুলে যাবে
দৃষ্টি হবে উদার।

গালিব, আমার আশঙ্কা এই যে আমার চেষ্টা কখনও
সফল হবে না।

পঙ্গপাল যে শস্যক্ষেত্রের ক্ষতি করতে পারেনি,
বজ্রপাতে সে ক্ষেতের ফসল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

দিনের বেলা আমার সর্বস্ব চুরি হয়ে গিয়েছিল,
তাই তো আমি রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পেরেছিলাম।
চোরকে অতএব ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত,
সম্পত্তি পাহারা দেওয়ার দায় থেকে সেই আমাকে মুক্তি
দিয়েছিল।

সরাইখানা থেকে আমাকে জোর করে বের করে দিয়েছে,
এখন যেখানে যাই না কেন, তাতে কি আসে যায় ?
হ'ক-না তা মসজিদ, পাঠশালা, এমন-কি একটা মঠ।

আমার দরদী আমাকে অপমানিত করেছে,
আমি তাকে ধিক্কার দিই,
ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা যার নেই,
সে কেমন করে হবে আমার বিশ্বাসের পাত্র।

আমি খাঁচায় বন্ধ হয়ে আছি।
বন্ধু, বাগানে যে দুর্দৈবের খেলা চলেছিল,

সেটা আমাকে অসঙ্কোচে বলতে পারো ;
গত কাল বাগিচায় যে বাজ পড়েছিল
সে তো আমার খাঁচায় পড়েনি।

যেখানে কেউ কোথাও নেই এমনি কোনো স্থানে
আমি যেন চলে যাই, যেন সেখানেই বাস করতে পারি,
কথা বলার লোক সেখানে নেই, কারো সঙ্গে তর্কাতর্কিও
হবে না।

একটা কাজ করতে হবে অবশ্য,
একটা বাড়ী বানাতে হবে, সে বাড়ীর
দরজা এমন-কি দেওয়ালও থাকবে না।
কোন প্রতিবাসী সেখানে থাকবে না,
থাকবে না আমার বাড়ীর ফটকে
কোনো দ্বার-রক্ষী।
যদি আমার সেখানে অসুখ করে, আমাকে দেখারও কেউ
থাকবে না ;
আর যদি মরেই যাই, কেউ থাকবে না শোক-করার।

জ্ঞানীরা বলেন যে, প্রতিটি শ্বাস আমরা গ্রহণ করি,
তা উত্তাপের সৃষ্টি করে এবং সেই উত্তাপ একদিন
শরীরকে গ্রাস করে নেয়।
আমার বড় দুঃখ এই যে আমার অন্তরের এই তাপ
অপ্রচুর।

এই তাপ আমাকে নিঃশেষ করতে পারছে না।
আমার যন্ত্রণার তাই আর শেষ নেই।
শরৎকাল ? অথবা বসন্তকালের কথা বলছ ?
ঋতু যাই হোক-না কেন,
আমার দশা সেই একই থাকবে,
সেই একই খাঁচায় বদ্ধ হয়ে আছি ;
আকাশের দিকে তাকিয়ে
নিজের অসহায়তার কথা ভাবতে ভাবতেই আমার দিন
কাটে।

সময় সময় আমারই ইচ্ছে করে
এই পৃথিবীকে বলি, ওহে কৃপণের শিরোমণি,
তোমার ভেতবে যে সব বহুমূল্য ধন-রত্ন রক্ষিত ছিল,
সেগুলি নিয়ে তুমি কি করলে ?

কেউ বাজে কথা বললে কান দিয়ো না,
কেউ যদি কোন অন্যায় করে, তার উল্লেখ কোরো না।

কেউ যদি বিপথে যায়, তার পথ রোধ করো।
কেউ যদি কোন ভুল করে, তাকে ক্ষমা করো।

বাসনা-হীন মানুষ কি এ পৃথিবীতে কেউ আছে ?
তা হলে ভেবে দেখতে হবে, সকলের সব ইচ্ছা কি করে
পূর্ণ হবে।

আমার নিজের এমন বাসনার সংখ্যা হাজার হাজার,
এই বাসনাগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিরই চরিতার্থতার জন্য
জীবন- বিসর্জন ও সার্থক।
এর মধ্যে বহু বাসনাই আমার চরিতার্থ হয়েছিল,
তবুও এমন অনেক থেকে গেল— যেগুলির নাগাল
পেলাম না।

নিপুণ তীরন্দাজ নই, ওত পেতে থাকা শিকারীও নই,
আমার খাঁচার এক কোণে আমি তাই বেশ শান্তিতেই আছি

মানুষ

ঈশ্বরের মহিমার স্ফুরণ মানুষের উপর হওয়াই উচিত ছিল,
সিনাই পর্বতের উপর নয়।
কে কতটুকু পান করতে পারবে সেটা হিসেব করেই তো
সুরার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়।

আমি তো একটি জলকণা মাত্র,
কিন্তু এই জলকণাই তো আসলে নদী।
বৃথা-গর্বী-মনসুরের মত আমি অবশ্যই
নিজেকে নদীর সঙ্গে তুলনা করি না।

তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাকে দুটি জীবন
দিয়েছেন।
আমি প্রতিবাদ করি নি। দরদস্তুর করার মত ঔদ্ধত্য
আমার নেই।

সভাগৃহে জ্বলে জ্বলে ক্ষয়ে যাওয়া মোমবাতির সমব্যথী
অনেকেই থাকে।
কিন্তু তারা কিছুই করতে পারে না।
দুঃখে বেদনায় তার জীবন জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল,
কিন্তু তার দরদীরা তাকে কিই বা সাহায্য দিতে পারত।

সকলের কথা বোলো না, খুব কম লোকেই শেষ পর্যন্ত
নানা রকমের ফুল, এমন-কি
গোলাপ হয়ে ফুটে উঠতে পারে।
কবরের নীচে যাদের স্থান, তারাও কত শত সুন্দরভাবে ফুটে
উঠতে পারত।

বন্ধুজনেব মজলিসখানাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে
একদা আমরাও জানতাম।
কিন্তু এই যে জানা, তা এখন বিস্মৃতিরূপ তাকের উপর
শোভ-মান রয়েছে,
অর্থাৎ সবই এখন ভুলে গিয়েছি।

বড় কিছু করার কত সুবর্ণ সুযোগ জীবনে এসেছিল,
এ সুযোগ যে হারিয়েছে— সে এ ব্যথা ভুলবে কেমন করে ?
হয়তো এই মূল্যবান মুহূর্তগুলিতে গভীর প্রার্থনায় তার
কেটেছিল।
তবু তার এ দুঃখ মুছে যাবার নয়।

পার্থিব সমস্যায় আমি যতই জড়িয়ে পড়ছি
আমার সত্য স্বরূপকে বুঝে নেওয়া ততই শক্ত হয়ে পড়ছে।

জীবন-দর্শন

জীবনের মূলেই রয়েছে ধ্বংসের বীজ,
ভাল করে দেখে রাখো, কৃষকের কপালের ঘাম
একদিন বজ্রাগ্নির রূপ নেবে,
তার ফসল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

গভীরভাবে ভালবাসা আবার নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি,
এই দুইয়েরই সহাবস্থানের চেষ্টা বা কল্পনা— এটা মূর্খতা
মাত্র।

বজ্রাগ্নির উপাসনা যে করে সে তো তার আগুনে সর্বস্ব
নিশ্চিতই খোয়াবে,
তখন আর হায় হায় করে কি লাভ।

সৌন্দর্যের ধ্যান, সে তো একটি সৎ কাজ
(আমি তো জীবনে তাই করে এসেছি)।
তাই তো আমার কবরের নীচে থেকে বেহেস্তের
দুয়ার খুলে গেছে।

জেনে রেখো, যে কাজ করা খুব সোজা বলে মনে হয়,
সে কাজ করে ওঠা খুবই কঠিন।
এমনই দুঃসাধ্য যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছে করলেই 'মানুষ' হয়ে
উঠতে পারে না।

কোন এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অক্লান্ত কাজের প্রেরণা
দিয়ে থাকে
মানুষেরই উচ্চাশা।
মৃত্যু যদি না থাকত,
তবে মানুষের জীবনের আকর্ষণ সবই লোপ পেয়ে যেত।

প্রতি জলকণাই দাবি করতে পারে : "আমিই সমুদ্র"
একজন যখন অন্যের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে,
সত্যিই তার আর পৃথক সত্তা কিছুই থাকে না।

একটি জলকণা থেকেই আন্দাজ করা উচিত,
নদীর গভীরতা কতখানি।
একটু টুকরো থেকেই আসে সমগ্রের বোধ।
যদি তা না হয়, তবে বুঝতে হবে,
দৃষ্টির অভাব, সবটাই অবোধ শিশুর খেলার মত।

তিনি যে জীবন আমায় অনুগ্রহ করে দিয়েছিলেন,
সে জীবন আমি ত্যাগ করেছি।
এই যে দিয়েছি, এটা কি সত্যিই দান ?
স্বর্গের ঋণ আমি তো শোধ করতে পারি নি।

যত সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়
সাফল্যও আসে ঠিক সেই মাপে।
যে অশ্রু-বিন্দু মোতিতে পরিণত হবার চেষ্টা করেনি,
সে তো জলকণাই থেকে যাবে।

মানুষের মন লক্ষ লক্ষ চিন্তার খেলার মাঠ,
নির্জনতা তাই আমার কাছে মনে হয়,
কলরব-মুখর বন্ধু-গোষ্ঠীর মেলা।

দিবারাত্রি ধরে চলেছে সাতটি তারার আবর্তন,
কিছু-না-কিছু তো ঘটবেই, এতে ভাবনার কি আছে ?

সারা জীবন ধরেই তো আমি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি।
মৃত্যু যখন সত্যিই আসবে, তখন আমার ভাগ্যে কি ঘটবে,
তা কি আমি জানি ?

প্রতি জলস্রোতের নীচে বিস্তারিত রয়েছে
হাজার হাজার ক্ষুধার্ত কুম্ভীরের করাল-গ্রাস।
একটি জলবিন্দুকে মুক্তায় পরিণত হতে হলে বাধা কত দুস্তর,
তা কি কেউ জানে ?

জীবনের দৈর্ঘ্য, সে তো চক্ষুর নিমেষ ;
পানোৎসবে যারা যোগ দেয়,
তাদের হুল্লোড় চলে শুধু ততক্ষণ
যতক্ষণ পর্যন্ত না কাঁপতে কাঁপতে
নিভে যায় মোমবাতির আলোক-মালা।

আসাদ! জীবনের যন্ত্রণার কোন প্রতিকার নেই
যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু এসে পড়ে ;
সর্ব ঋতুতেই বাতিগুলিকে জ্বলতে হয়,
সূর্যোদয়ের পূর্বকাল অবধি।

সে যদি আমার প্রতি একনিষ্ঠ থেকে থাকে,
লোকে বলবে এটা নিষ্ঠুরতা।
ভাল লোককে মন্দ বলে চিহ্নিত করা,
এটাই হল সাধারণ রীতি।

জীবনের ঘোড়া লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলে,
কোথায় যে তা থামবে, কেউই বলতে পারে না।
শক্ত মুঠোয় লাগাম আমরা ধরতে ঠিক পারি না,
আমাদের পা'ও ঠিক পা-দানির উপর রাখা যায় না।

বোঝার ক্ষমতা আছে এমন মনের কাছে,
সমস্যার ঝঞ্ঝাবাত যেন পাঠশালার মত।
ঝড়ের এক-একটা কশাঘাতের সঙ্গে গুরুমশায়ের সস্নেহ
বেত্রাঘাতের তুলনা দেওয়া যেতে পারে।

যন্ত্রণায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লে, যন্ত্রণাবোধ চলে যায় ;
আমি জীবনে এতই কষ্ট পেয়েছি,
যে এদের সামলানো আমার পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে

কারো কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা নিলে,
তোমার নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে যাবে,
সংসারের কাছে অতএব ঋণী না থাকাই সংগত,
আত্ম-তুষ্টির মনোভাব নিয়ে চলতে শেখো।

এই সংসারে 'টিউলিপ' ফুল ফোটে,
নিজের অভ্যন্তরে একটা দুষ্ট-ক্ষত নিয়ে,
এই ক্ষতই তাকে নিঃশেষ করে।
এমনি ভাবেই কৃষকের আপন শরীরের স্বেদ
বিদ্যুৎ-বহ্নিতে রূপান্তরিত হয়ে
তার উৎপাদিত ফসল পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

একটি জলবিন্দু নদী জলে মিশে, নদী হয়ে যায়।
"যার শেষ ভালো তার সব ভালো"।

বাড়ীতে কলরব ধ্বনিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন,
বেশ কিছু লোক-জনের সমাবেশ,
যদি উৎসব সংগীতের অবকাশ না থাকে
শোকসংগীতও গৃহ মুখরিত করতে পারে।

এই পৃথিবীর সমৃদ্ধি থেকে বোঝা যায়,
অনেক শক্তিমান ও দুঃসাহসী ব্যক্তির এখানে জন্মানো
বাকী আছে।

সরাইখানার পানপাত্রগুলি যদি সুরাপূর্ণই থেকে যায়
তবে এটাই বোঝা যায়, যে এই পান্থশালায় বেশী লোকের
যাতায়াত নেই।

চিরাচরিত ঐতিহ্যের অন্ধ-অনুসরণকারী,
জগতের বুদ্ধিজীবী সমাজ কিসের জন্য গর্ব করতে পারে ?

গালিব, অন্তিম বিনাশের পথ আমার চিন্তায় চিরজাগরূক,
জীবনের ঢিলে-ঢালা পাতাগুলো একত্রে বেঁধে রাখতে
এই চেতনার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রেম

তুমি বলছ, আমার যে মন তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ
তা আর ফিরে দেবে না।
আর ছলনার প্রয়োজন কি। তুমি হদিশ দিয়েছ অবশ্যই।
হৃদয় আমার অনেক আগেই খোয়া গিয়েছিল,
এখন জানা গেল, কার কাছে সেটা বাঁধা রয়েছে।

প্রেম থেকেই আমি জীবনের স্বাদ পেলাম।
সব ব্যথার ওষুধ তো পেলাম, কিন্তু প্রেমের ব্যথার ওষুধ
যে নেই।

আমার প্রেমিকা সরলা অথচ দুষ্টুমিও বেশ জানে
ভুলো-মন আবার হুঁশিয়ারও কম নয়।
তার আপাত-ঔদাসীন্য কাজে কাজেই আমাকে দুঃসাহসী
করে তোলে।

গোলাপের সুরভি, বিষাদের বেদনা অথবা বাতির ধোঁয়া
যা নিয়েই হোক-না, তোমার মঞ্জিল থেকে যেই চলে এসেছে,
সেই ফিরেছে গভীর-বেদনা নিয়ে।

প্রিয়তমার অবহেলার যন্ত্রণা আমি এড়াতে চেয়েছিলাম,
তার প্রতি আমার একনিষ্ঠতার ত্রুটি অবশ্যই ছিল না;
কিন্তু এতই সে নিষ্ঠুরা যে সে আমাকে মরতেও দেয় নি।

নবোদিত সূর্যরশ্মি যেভাবে প্রভাতকালে তৃণশীর্ষের শিশির-
বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হয়,
তোমার অস্তিত্ব তেমনি ভাবেই আমার হৃদয়-দর্পণে
প্রতিফলিত হয়েছিল।

গালিব, আমার হৃদয় ছিল জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার,
বিচ্ছেদের যন্ত্রণা আমার সেই হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

প্রিয়তমার জন্য আমার ব্যাকুলতাকে ধিক্কার,
বার বার সেই পাগলামি আমাকে তার বাড়ীর দিকে টেনে নিয়ে যায়,
এতে আমার যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়।

আমার শিরশ্ছেদ করার পর তার নিষ্ঠুরতায় ছেদ পড়ে।
চমৎকার! খুব তাড়াতাড়িই তার মনে অনুতাপ জেগেছিল।

আমার প্রতি তোমার এই অবহেলা,
সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।
আমার বেদনার কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে শুধু বলেই যেতে থাকি,
তুমি মন দিয়ে শোনোও না। একবার হয়তো অন্যমনস্ক ভাবে শুধাও—
"কি বলছ"?

ঈশ্বর যদি আমাকে বন্দী করে থাকেন,
তবে তাই ভাল, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।
কিন্তু তিনি কি এই বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন—
যে তাঁর আমাকে এই বেকায়দায় ফেলা,
প্রিয়তমার প্রতি আমার মুগ্ধতার অবসান ঘটাবে?

প্রিয়তমার সঙ্গে আমার মিলন— এটা ভাগ্যের অভিপ্রেত
ছিল না।
আমি যদি দীর্ঘদিন বাঁচতাম, তবে আজও আমি তার
অপেক্ষা করতাম।

তোমার বক্রিম কটাক্ষ লাভের আনন্দ ভাষায় প্রকাশের
অতীত,
অলজ্জিতা হয়ে সোজাসুজি আমার দিকে তাকাতে যদি,
আমি বুঝে নিতাম, আমার আর কোন আশা নেই।

গালিব, আমার প্রিয়তমা সর্বরূপেই আনন্দ-দায়িনী,
তার কথা, একটু ইশারা অথবা যে-কোন ভঙ্গিমা, সবই
আনন্দের উৎস।

আমার প্রেম-ব্যাধি কোন প্রতিষেধকের সাহায্য নেয় নি,
কাজেই এটা সারবার মত রোগ নয়, তা মন্দ কি!

অত্যাচারী সময়ের শিকার হয়েছিলাম, এটা সত্যি,
তবে এমন সময় কখনও ছিল না, যখন তোমার চিন্তা
থেকে মুক্ত ছিলাম।

বিরোধ ছিল বলেই তো ধরে নিতে হবে পরস্পরের মধ্যে
একটা সম্বন্ধের অভাব ছিল না।
যখন এক দিক থাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় উদাসীন তখন
অপর জন প্রতারিত হতে পারে না।

যেহেতু আমি কানে শুনি কম, আমার দ্বিবিধ আব্‌দার
তোমায় সহ্য করতে হবে।
দুবার করে না বললে কোন কথাই আমি যে বুঝে উঠতে
পারি না।

প্রিয়তমার প্রেমের জন্য হা-হুতাশ করতে করতে হয়তো
জীবনই কেটে যাবে,
তখন হয়তো কিছু ফল লাভ হতে পারে ;
তোমার কেশ-দামের পূর্ণ দৈর্ঘ্যলাভ পর্যন্ত
কে বল অপেক্ষা-রত থাকবে ?

আমি মেনে নিলাম যে তুমি আমাকে একদিন কাছে ডাকবে,
কিন্তু তোমার আহ্বানের অবসর যখন আসবে,
তার আগেই তো আমি ফুরিয়ে যাব।

কত কত রাত্রি ধরে আমি প্রিয়া-মিলনে বঞ্চিত রয়েছি,
তার হিসেব যখন করতে বসি
সব ভুলে যাই। জানি না কতদিন কাটল জীবনরূপ এই
মরুভূমিতে।

আমার চিঠি নিয়ে যে পত্রবাহক প্রিয়ার কাছে গিয়েছে,
জবাব সহ তার ফিরে আসার আগেই আর একটা চিঠি
লিখতে হবে,
আমার আগের চিঠির কি জবাব আসবে তা তো
জানাই আছে।

মজলিসে আমার কাছে পান-পাত্র তো কখনও পৌঁছায়নি।
ভাগ্যক্রমে আজই পৌঁছালো। আমার ভয় এই যে
'সাকী' এর সঙ্গে আরও কিছু মিশিয়ে দিয়েছে।

একটা চোরা কটাক্ষের দাম হাজার প্রেম-কলার চেয়ে বেশী,
হাজার রকম সাজগোজের চেয়ে প্রিয়ার রোষ অনেক
বেশী উপভোগ্য।

বেকুফেরাই কামনাকে মনে করে পূজা!
কী লজ্জা, আমি কি নিষ্ঠুরা হৃদয়হীনা স্ত্রীলোকরূপী এই
মাটির পুতুলের পূজক!

কান্না আর কিছু নয়, এটা যেন বলতে চায় আবেদনের সুরে,
'ওগো নিষ্ঠুরা— দয়া কর'।
বিনা প্রতিবাদে যদি আমি এমনি কেঁদেই চলি,
তবে তোমার নিষ্ঠুরতাকেই প্রশ্রয়ই দেওয়া হবে।

ঈশ্বরের কি মহিমা, সে আমার বাড়ীতে এসেছিল।
আমি কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলাম তার দিকে পলকহীন চোখে,
আবার তাকিয়েছিলাম আমার এই দীন-কুটিরটির দিকে।

প্রতিযোগীর প্রতি সকলেই ঘৃণা পোষণ করে।
কিন্তু আশ্চর্য, জুলেখা মিশরী রমণীদের প্রতি
কোন বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নি। তিনি খুশী হয়েছিলেন,
যে ঐ রমণীরাও তাঁরই মত কন্‌আনের চাঁদ ইউসুফের
প্রেমে বদ্ধ হয়েছে।

তোমার কেশ-পাশ যার বাহুর উপর লুটিয়ে পড়েছিল
(হে সুন্দরি),
তার নিদ্রা কত মধুর হয়েছিল, তার ভাগ্য কত প্রসন্ন ছিল,
রাত্রিটি তাকে কত সুখেরই না অধিকারী করেছিল।

প্রেমহীন জীবন যাপন সম্ভব নয়,
আবার আমার অবস্থা এতই কাহিল, যে আমার আর
প্রেমের জ্বালা
সহ্য করার শক্তিও নেই।

ধর্মভীরু যে, প্রেমে যে একনিষ্ঠতার দাবি করে,
সেই পুরুষ কেন এমন রমণীর ছায়া মাড়ায়—
যে ধর্মভীরু বা এক-নিষ্ঠা নয় ?

আমি বলছি না যে তোমার ভালবাসা কেবল আমাতেই
নিবদ্ধ থাকবে।
তবে তুমি অখুশী হলেও আমি এই চাই
তোমার শিকার যেন আমিই হতে পারি, আর কেউ না।

আমার ক্ষোভ এই যে তুমি আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর
কথা ভেবে
আমার কাছে তার প্রসঙ্গ উঠিয়েছিলে।
তার প্রতি তোমার অবজ্ঞাই প্রকাশ পেয়েছিল,
কিন্তু এ প্রসঙ্গের অবতারণাই বা কেন ?

তুমি আমাকে অবজ্ঞা করতে চাও কর। কিন্তু তোমার সঙ্গে
আমার পুনর্মিলনের আশা,
একেবারে নষ্ট হতে দিয়ো না।
তোমার ঐ নিরুত্তাপ দৃষ্টি আমার কাছে যেন বিষের মত
বোধ হচ্ছে।

যখন প্রেমে পড়েছিলে, তখন আর চেঁচামেচি, কান্নাকাটি
কেন ?
তোমার হৃদয়ই যখন ভেঙেছে, তখন তোমার রসনাও
নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া উচিত।

সে যখন তার চড়া মেজাজ ছাড়তে চায় না, তখন আমিই বা
আমার স্বভাব বদলাব কেন ?
"ওগো, তুমি আমার উপর রুষ্ট হয়েছ কেন" ? এমনি
ভাবে তার সঙ্গে কথা বলে
আমি নিজেকে ছোট করতে পারব না।

একি বিশ্বস্ততা ? ভালবাসাই বা কোথায় ?
আমার মাথাই যদি ভাঙে
তোমার দুয়ার-প্রান্তে, হে নিদয়ে !

হায় বন্ধু, আমার এত কান্নাকাটি না করাই ভাল ছিল।
আমি তো জানতাম না যে এই কান্নাকাটি হা-হুতাশ,
আমার যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দেবে।

গালিব, আমি চাইছি প্রিয়ার সঙ্গে দেখা করে তাকে জানাই
তার সঙ্গ-চ্যুতি আমার মনে কি দুঃসহ ব্যথার সৃষ্টি করেছে।
হায়, সে দিন যেন আসে, যেদিন আমার সৌভাগ্য হবে
প্রিয়ার কাছে যাওয়ার আর এ কথা বলার
যে আমি তার সঙ্গে মিলন চাই, আর তার বিচ্ছেদ কত
মর্মান্তিক !

গালিব, আমরা নিশ্চয়ই তোমার প্রিয়াকে জানাব
তোমার বিচ্ছেদ-বেদনার যন্ত্রণার কথা।
কিন্তু সে তোমাকে কাছে ডাকবে কিনা
তা আমরা বলতে পারব না।

আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো না, এক কালে তুমি আমাকে
বলতে
"তুমিই আমার জিন্দ্‌গী"।
এখন আমি বেঁচে থাকা বা 'জিন্দগী'তেই
অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি।

ঈশ্বরের দোহাই, আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ো না
আমার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক না রাখতে পার,
বিরাগটা অন্ততঃ বজায় রেখো।

তুমি বলতে চাইছ যে আমার দুশমন তোমার প্রণয়াসক্ত,
হোক তা।
কিন্তু তাই বলে তোমার ঔদাসীন্য কেন সহ্য করব,
কেনই বা তোমার প্রতি একনিষ্ঠ থাকব ?
আমি এত নির্বোধ নই।

তার দেখা পাওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছি,
এই সৌভাগ্যে আমি নিজেই নিজেকে ঈর্ষা করছি।
তাকে দেখার সৌভাগ্য হবে, এই সুখ যেন অসহ্য।
হায় কত দুর্ভাগা আমি।

তোমার চিন্তার গভীরতা, তোমার হৃদয় শুষে নেবে
খুবই শীঘ্র,
তীব্র মদিরা তার আধারকেও গলিয়ে দেবার শক্তি রাখে।

তার প্রতি আমার যে প্রেম সেটা 'আমি তার পরোয়া
করি না,'
—এমনি একটি মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখি।
সে যখন সামনে আসে তখন আমি যেন কি রকম হয়ে পড়ি।
প্রিয়ার চতুর-চোখে সত্য ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়।

আমার নয়নানন্দদায়িনীকে দেখতে পেলেই আমি খুশী,
আর আমি কিছুই চাই না।

আমার সন্দেহ আছে— বেহেস্তের হুরীদের মধ্যেও
তোমার মত অতুলনীয়া সুন্দরী কেউ আছে কিনা।

আমি মরে গেলে তোমার বাড়ী যাবার রাস্তায়,
আমাকে কবর দিও না।
কারণ সেটাই হয়ে উঠবে পথিকদের পক্ষে
তোমার বাড়ীতে পৌঁছানোর নিশানা।

ওগো, প্রিয়ার বাড়ীর গলিতে তোমরা যারা বাস করো,
নিশ্চয়ই তোমরা জানো প্রিয়ার বাস-গৃহ কোনখানে ;
দয়া করে একটু চোখ রেখো,
পাড়ায় যদি তোমরা ভ্রাম্যমাণ বেচারা গালিবকে দেখতে
পাও।

আমার সুপ্ত কামনার যন্ত্রণা আমাকে যে দহন-জ্বালা দিচ্ছে,
নরকাগ্নিও তা দিতে পারত না।

তার চড়া-মেজাজের অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে,
তবে দেখছি, এখন তার যে কোপনতা প্রকাশ পেল,
তা আরও ভয়ংকর।

প্রিয়া মিলনের শুভ-সন্দেশ পাচ্ছি না,
তার রূপ এক নজর দেখতেও পাওয়া যাচ্ছে না।
বহু দিন থেকে আমার চোখ আর কান
দুই-ই অচরিতার্থ।

চাঁদ যখন ষোলো-কলায় পূর্ণ, তখনই তার সৌন্দর্যের
পরাকাষ্ঠা,
এতে সন্দেহ নেই।
তবে, আমার চন্দ্র-মুখী প্রিয়তমা যখন সূর্যপ্রভার মত
ঝল্‌মল্‌ করে
তখন তাকে আরও বেশী চমৎকারিণী মনে হয়।

প্রিয়তমাকে দেখেই আমি খুশীতে ঝল্‌মল্‌ করে উঠি,
আর আশ্চর্য এই যে, সে ভাবে শুধু আমার স্বাস্থ্য ভাল
হয়েছে।

তুমি যদি ভেবে থাক,
আমার মৃত্যুবরণ আমার ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ নয়,
তবে তাতে কিছু যায় আসে না।
তুমি যদি আরও পরীক্ষা করতে চাও,
তা করতে পার। এটার কথা ভুলে যাও।

প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে 'রাখ্‌-ঢাক্‌' আর সংযমই যদি
থাকে,
তবে আর 'মিলন' কোথা? এটা তো বিচ্ছেদের চেয়ে
মন্দ কম নয়।
উপভোগ তখনই চরম, যখন নিজেই বেশ কিছু এগিয়ে
আসে নায়িকা,
আর নায়ক হয়ে ওঠে বেশ একটু উদ্দাম ও চঞ্চল।

একদিন নিশ্চয়ই তাকে আমি চুম্বন করতে পারব।
এর জন্য চাই তীব্র-বাসনা আর বেপরোয়া দুঃসাহস।

খুব সম্ভব প্রিয়া স্বপ্নের মধ্যে আমায় সান্ত্বনা দিতে আসবে।
কিন্তু তার আগে আমার চিত্তজ্বালা শান্ত হয়ে ঘুম আসা
প্রয়োজন।

সে যদি আমার প্রিয়ার প্রেমে পড়ে গিয়ে থাকে,
তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, এটাই স্বাভাবিক।
সে আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গিয়েছে,
যদিও তাকেই আমি পাঠিয়েছিলাম প্রিয়ার কাছে
আমার বার্তাবহ রূপে। সে তাই থেকে যাক্-না কেন।

প্রণয়ের ব্যাপারে জীবন-মৃত্যুর ভেদ খুবই কম,
যার জন্য প্রাণটা যেন বেরিয়ে যায়,
তার সঙ্গে মিলনেই আবার যেন বেঁচে উঠি।

আত্ম-বিষয়ক

কফিন-বিহীন এই লাশ গালিবের,
ঈশ্বর তাকে কৃপা করুন, তার মধ্যে তো ধার্মিকতা ছিল না।

চুপ করে থাকি বটে, তবে বহু অচরিতার্থ বাসনা আমার
মনের মধ্যে চাপা আছে,
আমি যেন একটা অন্ধকার কবরখানায় নির্বাপিত মোমবাতি।

আমার দুঃখ দুর্দশায় বন্ধুর যে সহানুভূতি,
আমাকে বাঁচিয়ে তুলতে চায়, তা কি কাজে আসে ?
আমার ক্ষতগুলি যতক্ষণে সেরে ওঠার অবস্থায় আসে,
তারই মধ্যে আমার হাতের নখগুলি বেড়ে ওঠে,
আর তাদের কাজে লাগিয়ে আবার আমি নূতন ক্ষতের
সৃষ্টি করে ফেলি।

পরমেশ্বর যদি আমাকে দেখা করতে ডাকেন,
তবে সেই আহ্বানকে আমি অবশ্যই 'স্বাগত' জানাব।
কিন্তু আমাকে কি কেউ বলে দেবে,
আমাকে কি উপদেশ দেওয়ার ইচ্ছা তার আছে ?

তুমি আমার সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে,
তবু আজও আমি বেঁচে আছি ;
কারণ তোমার সেই প্রতিশ্রুতি আমি বিশ্বাস করি নি।
যদি বিশ্বাস করতাম তবে সেই প্রতিশ্রুতির আনন্দেই
আমার মৃত্যু হত।

তুমি কি সুন্দর রহস্যবিদ্যার ব্যাখ্যান কর, গালিব !
হায়, তুমি যদি মদ্যপ না হতে,
তবে তোমাকে আমরা সাধু-সন্ত বলেই মেনে নিতাম।

আমি অবশ্যই ঈশ্বরের সৃষ্ট,
তবু আমি নিজেকে স্বাধীন ভাবি।

আমার আত্ম-সম্মান বোধ এত প্রখর,
যে স্বর্গের দরজা আমার জন্য যদি নিজেই না খুলে যায়,
তবে সেখান থেকে আমি নির্দ্বিধায় ফিরে চলে আসব।

গালিব তো অনেকদিন গত হয়েছেন,
তবু আমরা তাঁর বাণী যখন তখন স্মরণ করি,
বলি— তিনি হলে, এ বিষয়ে কি বলতেন।

উর্দু শায়রীর তুমিই একমাত্র ওস্তাদ নও, গালিব!
সকলেই বলে অতীতেও একজন ছিলেন, তাঁর নাম মীর।

আমার মুখে প্রিয়ার রূপের ব্যাখ্যান শুনে,
যে ছিল আমার বিশ্বাসী বন্ধু, সে হয়ে গেল আমার
প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।

আকাশের উচ্চতম স্থল 'অরস,'
তারই এদিকে হায়, যদি কিছু জায়গা পাওয়া যেত
তবে সেখানে আমি একটা নিরীক্ষা-ঘর বানাতাম
আরও উঁচুতে।

আমি কখনও জ্ঞানী ছিলাম না, কোন বিষয়কর্মেও পটু
ছিলাম না,
তবে বিনা কারণে, ভাগ্য আমার উপর এত বিরূপ হয়ে
উঠল কেন?

ওরা জিজ্ঞাসা করে গালিব কে ?
আমাকে কেউ কি বাৎলে দেবে, ওদের কী জবাব দেওয়া
যেতে পারে ?

মোমবাতি যখন নিভে যায়, তখন ধোঁয়া ওঠে,
আমার মৃত্যুর পর, প্রণয়িনীর শোকের চিহ্ন তাই কালো
পোষাক।

"প্রেমের সর্বগ্রাসী সুরা পান করার সাহস কার আছে,
কে আসবে এগিয়ে ?"
আমার মৃত্যুর পরে, আমার সাকীর কণ্ঠেও এই আওয়াজ
ধ্বনিত হবে।

আমি এখন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি,
আর প্রিয়া বলতে চাইছে,
'ও কী চায় না জানালে, আমি ওর মনের কথা কি করে
বুঝব ?'

যদিও জান তোমার অনুরোধ মানা হবে
তবুও কিছু চেয়ো না।
যদি কিছু চাইতেই হয় তবে কামনা-শূন্য হৃদয়ের প্রার্থনা
জানিও।

কত শত বাসনা আমার নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে
সে সব কথা মনে পড়ে যায়। হে ঈশ্বর, তোমার দোহাই,
আমার পাপের ফিরিস্তি চেয়ে বোসো না।

আমার ভাগ্য ঘুমিয়েই থাকে,
তার কাছ থেকে আমি শুধু একটিমাত্র সুখস্বপ্ন ধার
চাইছি ;
গালিব, এই ঋণটিই বা আমি শোধ করব কি করে ?

পৃথিবীর সবাই আমার আদর্শ অনুসরণ করবে
এমনি ভাবা বাতুলতা মাত্র।
যেখানে যা কিছু ভাল আছে
তা সকলেরই চিত্ত জয় করবে
এটা কি কখনও সম্ভব হয় ?

হায় ভগবান, সংসার কেন আমার অস্তিত্ব মুছে ফেলতে
চাইছে ?
জীবনের পাতায় আমি তো দুবার লেখা অনাবশ্যক শব্দ
নই।

আমার হৃদয় রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া,
এটা তো ইঁট অথবা প্রস্তরখণ্ড নয়।
আমার যখন খুশী তখন আমি কাঁদব,
কেউ যেন তখন আমাকে উপহাস না করে।

এটা মন্দির নয়, মসজিদ নয়, সাধুসন্তের মকবরাও নয়,
আমি একটা রাজপথে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি,
আমাকে এখান থেকে কোনো লোক কেন তাড়িয়ে দেবে ?

বড় ঘরে তার জন্ম, তার উপর সে সুন্দরী, কাজেই তার
স্বভাব উদ্ধত।

এদিকে আমার আত্ম-মর্যাদা জ্ঞানও বেশ টনটনে,
সকলের সামনে তার কাছে ঘেঁযা মুস্কিল,
আবার সেও তার কাছে আমাকে ডেকে নেবে না!

আমার দুঃখ দুর্দশায় উপেক্ষা যদি তোমার স্বভাবে দাঁড়ায়,
এই অবস্থা কেমন করে মেনে নেওয়া যায় তা আমাকে
আস্তে আস্তে
শিখে নিতে হবে।

এ সংসারে হাতের কাছে যা পাওয়ার সম্ভাবনা
এবং পরলোকে যা পাওয়া যেতে পারে, দুই-ই লোভনীয়;
আমার আত্ম-মর্যাদা বোধ আমাকে রক্ষা করেছে,
আমি দুটোই নিতে অস্বীকার করেছি।

আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা আমাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে,
এর হাত থেকে কিছু কালের জন্যও যদি মুক্তি পেতাম
তবে দেখিয়ে দিতাম, মজনুর কীর্তি কতই অসার।

নিজের প্রতি

গালিব, আমি জীবনের ঝড়-ঝাপ্টা সবই তো পার হয়ে
এসেছি,
এখন আমি শুধু আকস্মিক মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছি।

গালিব, কি দুঃখময় জীবনই-না আমি যাপন করেছি,
কোন্ স্মৃতি আমি বহন করে বেড়াব : আমাকে দেখার জন্য
ঈশ্বর কি ছিলেন না ?

বসন্ত-ঋতুর আমন্ত্রণে বহুদিন যথোচিত সাড়া দিই নি,
এখন সময় এসেছে প্রার্থনা-কারীর পোষাক আর আসন
বন্ধক দিয়ে
সুরার সাহচর্য।

এমন কি কেউ আছে যে গালিবকে চেনে না ?
সে তো একজন ভাল শায়র, তবে ওর অনেক বদনাম।

বসন্ত ঋতু

এত রঙের মেলা নিয়ে বসন্তকালের সমাগম হয়েছে,
যে তার শোভা-দর্শন-কারীর মধ্যে আছে চন্দ্র ও সূর্য পর্যন্ত।

হে পৃথিবীবাসিগণ, দেখ দেখ দেখ
সংসারের কী বিচিত্র অঙ্গ-রাগ।

ধরিত্রীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সবুজের কী
শোভা,
নীলাকাশের গম্বুজ এই শোভার কাছে হার মেনে যায়।

সবুজ আর কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে
জলের উপর শেওলার রূপ নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

নার্সিসাসের চোখ শুধু
সবুজের শোভা ও পুষ্পের সমারোহ দেখার জন্যই।

বাতাস যেন নেশার আমেজে ভরপুর,
নিঃশ্বাস টানলেও যেন নেশা লাগে।

ইচ্ছা-পত্র

পাথিব স্ফূর্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণের অভিলাষী হে নবাগতের
দল,
সুরা ও সংগীতে যদি তোমাদের আসক্তি থাকে, তবে
সাবধান হও।

যদি তোমাদের দেখে শেখার মত চোখ থাকে, আমাকে দেখ,
উপদেশ শোনার মত কান যদি থাকে, তবে আমার কথা
শোন।

সুন্দরী 'সাকী' জ্ঞান ও ধর্মের হন্ত্রী
মধুকণ্ঠী গায়িকা প্রতিষ্ঠা ও বুদ্ধি হারিণী।

গত রাত্রে আমরা কি দেখেছিলাম ?
জলসাঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত
প্রতিটি স্থান,

দেখাচ্ছিল যেন বাগিচার মালীর ফুলের ঝুরি
অথবা ফুলওলার বানানো ফুলের তোড়ার মত।
সাকীর মন্থর গতির চরম সৌন্দর্য, আর
একর্ডিয়ন বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনির আনন্দও সেখানে ছিল।
পরের দিন প্রভাতে সেই ঘরেই দেখা গেল আর এক দৃশ্য,
পানোন্মত্তদের বেপরোয়া খুশীর হুল্লোড় সেখানে আর
ছিল না।
গত রাত্রির আনন্দ-উৎসবের ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ সেখানে
পড়েছিল
একটি ভগ্নহৃদয় অর্ধ-দগ্ধ মোমবাতি। সেটিও ছিল নীরব
ও মৃত।

আমার চিন্তার প্রেরণা আসে এক অদৃশ্য লোক থেকে,
গালিব, আমার এই যে লেখনী-সঞ্চালন এটা হল দৈবাগত
বাণীর অনুরণন।

বিবিধ

প্রিয়ার কথাগুলি আমার খুবই ভাল লেগেছিল,
তার কথাগুলি মনে হয়েছিল
যেন আমার হৃদয়েরই প্রতিধ্বনি।

হে সাকী, প্রসন্ন হয়ে আজ তুমি আমাকে প্রাণভরে পান
করতে দাও।

অন্য দিন, রাত্রির পর রাত্রি কম-বেশী যতটুকু পাই,
তাই নিয়েই তো আমি সন্তুষ্ট থাকি।

বন্ধু, তার সঙ্গে তুমি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে,
তার জন্য আমি তোমার উপর দোষারোপ করছি না।
যে পত্রবাহক প্রেমিকার কাছে গিয়েছিল
তার প্রতি অশিষ্ট আচরণের জন্য তাকে
অবশ্যই সেলাম জানাবে।

খিজির নামে যে পয়গম্বর পথভোলা পথিককে পথ দেখাতেন,
তার আদর্শ অনুসরণ করতেই হবে এমন কোন কথা নেই।
তবে হ্যাঁ, সফরের সময় তিনি আদর্শ বন্ধুর কাজ করতেন,
এতে সন্দেহ নেই।

আমার অন্ধকার কারাগৃহে
আছে শুধু একটানা দুঃখনিশার প্রবাহ।
উষার একমাত্র নিশানা যে বাতির আলো সেটাও মৃত,
অন্ধকারের একঘেয়েমিতে নেই কোনো ছেদ।

আমার মাটির পানপাত্রটি ভেঙে গেলে,
আপসোসের কিছু নেই, বাজার থেকে আর একটি কিনে
আনলেই চলবে,

এমন যে সুলভ জিনিস, এটা ইরাণের বাদশা জামসেদের পানপাত্রের থেকেও অনেক ভাল।

সুর-ভরা বাদ্যযন্ত্রের মত,
আমার মনের মধ্যেও অজস্র বেদনা।
একবার ছুঁয়েই দেখ, কত সুরই-না সেখানে ঝংকৃত হবে।

যে ক্ষত সেরে উঠতে পারে, এমন ক্ষত আমার জন্য নয়,
হে ঈশ্বর, আমার দুশমনকে এমনি ক্ষতই দিও।

কেউ যদি মৃত্যুর মধ্যেই তার যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে চায়,
তবে তাকে তীব্র হতাশার শিকার হতে হবে, মৃত্যু যদি
না আসে।

আজ আসবে না, তবে একদিন সে আসবেই
মৃত্যুর এই পণ। মৃত্যুর বিরুদ্ধে এইজন্য
আমার তীব্র অভিযোগ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

অনর্থ সৃষ্টির শক্তি তোমার মধ্যে এমন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে,
যে তুমি পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পার।
তুমি যদি কারো ভালো করতে চাও,
তবে কোন দুষ্ট-গ্রহের প্রয়োজন হবে না,
সে বেচারা এমনিই খতম্ হয়ে যাবে।

ঈশ্বরীয় বিধান আর রাজার আইন,
এই দুটিই সামাশৃিজক-শৃংখলা বজায় রাখে।

কিন্তু যে শয়তান এই নীতি-নিয়মের ধার ধারে না,
তাকে তোমরা কি করে সামলাবে ?

একটি কথা বললেই যখন তোমার জিহ্বা ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা,
তখন তোমার চুপ করে, যা বলা হচ্ছে তাই শুনে যাওয়াই ভাল।

মধু-শালার সঙ্গে ধর্মোপদেস্টার কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়।
কিন্তু কি আশ্চর্য, গালিব, গত রাত্রে আমি যখন পান-শালা থেকে বেরিয়ে আসছি,
তখন দেখলাম, মহাশয় ব্যক্তিটি সেখানে ঢুকছেন।

ওহে গালিব, ধর্মোপদেশক মশায় তোমাকে গালাগালি করেন,
এতে তুমি ক্ষুব্ধ হোয়ো না। এমন লোক কি কেউ আছে,
যাকে সবাই প্রশংসা করবে ?

সাকীকে এ কথা জানাতে সংকোচ হয়,
তবে আসলে পানপাত্রে মদিরার তলানিটুকু পেলেও
আমি পরম সন্তুষ্ট।

আমার নিজের দেশ থেকে বহুদূর বিদেশে আমার মৃত্যু হ'ল;
আমি যে বন্ধুহীন
এ লজ্জার গ্লানি থেকে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করলেন।